Raka

Gargi Bhattacharya

******

COPYRIGHTED MATERIAL

রাকা

গল্প সংকলন

(৬টি গল্প-ছয় বন্ধুর)

গার্গী ভট্টাচার্য

ঝরা পাতাদের---

ঝরা পাতাদের আমি খুব ভালোবাসি । আমি এখন সবুজ , সতেজ পাহাড়ে থাকি । হেমন্তে- ঝরাপাতার সারি আমার বাগান ও ড্রাইভওয়ে ছেয়ে থাকে । শীতেও তাদের দেখা যায় । গুচ্ছ গুচ্ছ । আমি ঘর সাফ করে কিছু ঝরা পাতা ছড়িয়ে দিই । লোকে অবাক হলেও আমার ভালোলাগে ।

ঝরাপাতার বুকে অনেক গল্প, কথা আর গান থাকে । ওরা তো কথা বলতে পারেনা ! পারলে জানা যেতো অজস্র কাহিনী । ঋতুর পরিবর্তনের সাথে সাথে ওরা যেমন খোলসের মতন ঝরে পড়ে, টুপ্‌টুপ্‌ করে সেরকম ওদের শুকনো চেহারায় একটা অদ্ভুত সৌন্দর্য্যও দেখা যায় । হলুদ ও সোনার বরণ তাদের !

আমি সেই রূপকথাটুকুই মেলে রাখি আমার বারান্দা আর মেঝের ওপরে ।

ঘন আঁধারে ; আমি সাবেকি এক লন্ঠন নিয়ে ওদের খুঁজি । সেই অচিন মহলে যেমন রহস্যময় চৌকিদার , মধ্যরাতে এক লন্ঠন নিয়ে জানতে চায় ; কাকে চাই ?

সেরকম আমিও ওদের মুখে আলো ফেলি । একটা বড় গাছের কোনো পাতা নেই । শুধু মরা ডালপালা । পরে তাতে সাদা অথবা বেগুনি কিংবা লাল ফুল । পুরো

গাছে কেবল ফুল । হঠাৎ একদিন সব ফুল ঝরে গিয়ে সবুজ কচি কচি পাতা দেখা দিলো।

আবার আমার পড়শী মিসেস কোকোনভ্ ,ওদের গাছের নিচে একটা সুন্দর বেতের ঝুড়ি পেতে দিলেন । । সেই গাছে মেরুন আর লালচে-গোলাপী ফুল হয় । সেই পাপড়ি ঝরে ঝরে পড়ে ঐ ঝুড়িতে আর উনি সেটা নিয়ে ঘরে সাজিয়ে রাখেন । আমার এরকম গাছ নেই তাই শুক্নো পাতাই আমার জাদুকরী বন্ধু !

ওদের গুনতে শুরু করি আর আমার সন্ধ্যেটা যেন কাটতেই চায়না !!

সোফার ওপরে কিছু ; আবার শয্যায় । এইভাবেই পাতাঝরা ক্ষণ আমাকে স্পর্শ করে প্রতিদিন । আমাকে ছুঁয়ে থাকে- অবিনশ্বর এক আবেগে । এই পরবাস বেলায় । হেমন্তে তাই আজ আর বিষ নেই , হেমন্ত ভরে থাকে মধুর নেশায় ।

বাংলার বুকে আজ আমি এক ঝরাপাতা ! বড় কষ্ট এই ক্ষুদ্র প্রাণে !!! বাংলার সবুজ , মাছের ঝোল আর দুর্গা পুজো খুব মিস্ করি । কিন্তু ফেরার আর কোনো পথ খোলা নেই ! তাই ঝরা পাতা কেবল ঝড়কেই ডাকে । যদি উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে সজীব বাংলার শামিয়ানায় ----------শ্যামলিমায় !!

অনেক বাংলা সিনেমা দেখি, গান শুনি । রান্নার ভিডিও দেখে বাঙালী রান্না করি । সবুজ মাঠ, ধানক্ষেত , নদী আর গ্রামীণ পথ দেখে দেখে সাধ মেটেনা । মনে হয় ফিরে যাই মাতৃভূমে ! কিন্তু অসময়ের এই মনোবৃষ্টি থেকে এক বিন্দু জল চুইয়ে পড়েনা । তাই শুস্ক মরুর মতন মন নিয়েই বেঁচে থাকি ।

এখানেও রূপকথা দেখি ! রাতের আঁধারে প্রচন্ড দাবানল। লেলিহান শিখায় পুড়ে যাচ্ছে কত মানুষের স্বপ্ন । নিপুন শহর , লোকালয় , বড় বড় শস্য ক্ষেত, সর্ষে ও আলু ক্ষেত, ক্যাঙারুর খেলাধূলা ,আর আকাশে উড়ে যাওয়া সমস্ত পাখিই অপরূপ । চড়াই বা কাক নয় । লাল লাল টিয়া, ময়না, সিগাল, সাদা রং সোনালী ঝুটির পাখি, রামধনুর মতন পাখি । রামধনু, ইয়া বড় চাঁদ একেবারে রূপার কাজ করা আর রঙবাহারি গাছের ঝরা পাতা ও ঝরা ফুলের শোভা । তবুও মনে হয় বাংলার রূপ যেন অন্যরকম । একের পর এক উৎসব আসে , চলে যায় । আমরা কালীপুজোতে মাংস পুড়িয়ে খাই বনের ধারে । হোলিতে ; রাধাকৃষ্ণের মন্দিরে রং খেলি । এই আমাদের প্রবাস জীবন । আর বাংলা ডাকে দুই হাত তুলে --- ফিরে এসো , ফিরে এসো সব ভুলে-- মায়ের কোলে !

কিন্তু ফেরার আর কোনো উপায় নেই -এই তো জীবন !

নদীর এপাড় কহে, ছাড়িয়া নিঃশ্বাস ;

ওপাড়েই সর্ব সুখ , আমার বিশ্বাস---

রাকা

ছয়জন বন্ধু, স্কুল থেকে একে অন্যকে চেনে । ওদের বন্ধুত্ব এতই গভীর ছিলো যে অনেক বয়স হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও ওরা একে অপরের সাথে যোগাযোগ রেখেছে । আমাদের জীবনের সবকিছুই বদলে যায় । শিক্ষাজগৎ , পাড়া , আত্মীয়-স্বজন , বন্ধু আর কর্মক্ষেত্র । বেশির ভাগ মানুষের এসবে বদল আসে । কিন্তু এই ৬জন আজও একই সুত্রে বাঁধা ।

রাকার ৫০ বছরের জন্মদিনে ,কলকাতার চেয়ে একটু দূরে একটি বাংলোয় পার্টি দিয়েছে রাকা আর তার স্বামী অশেষ । বাড়িটা বিরাট । অশেষের বাবার কেনা । লোকাল লোক দেখাশোনা করে । গ্রামীণ পরিবেশ । কিছু জমিতে চাষাবাসও হয় । তবে অশেষ আসে কম । ওর

দিদি এই বাড়িটা দেখাশোনা করে । দিদির স্বামী নেই । একমাত্র পুত্র আমেরিকায় না গিয়ে ইউরোপে গেছে । সেখানে কাজ করে । বিদেশিনী বৌ জুটিয়েছে । দিদি একা এই বাড়িতে থাকে আর অশেষ কিংবা অন্য কেউ এলে তাদের আতিথেয়তায় কোনো ত্রুটি রাখেনা । মন দিয়ে সেবা করে ।

এখন বৌমার, মানে রাকার ছেলেবেলার বন্ধুরা সবাই আসবে শুনে খুবই আহ্লাদিত , সবাইকে দেখবে , জানবে বলে । কিছুটা কৈশোর আঁচ করবে ; বৌয়ের ।

রাকা খুব কম কথা বলে । তাই তার পূর্বাশ্রমের ব্যাপারে বিশেষ কিছু কেউ জানেনা ।

অশেষের সাথে সম্বন্ধ করেই বিয়ে হয় । বৌমা চাকরি করেনা । করার দরকার নেই । সন্তান পালন করা আর সংসারের দেখাশোনা-- এই করেই দিন কাটায় । অশেষের বাবার অনেক টাকাকড়ি ছিলো তাই ওদের সমস্যা হয়না ।

রাকা আগে, ওর শ্বশুরের ভিটেটায় গেছে । সেটা অন্য এক গ্রামে । মোহিনপুর। টেরাকোটার মন্দির আছে সেখানে । অবশ্য বহু যুগের পুরনো সেগুলি। আর এই বাংলোটা-- গোলাপগড়ে । বাংলার সবুজ একদম আলাদা । গাছপালা , মাঠঘাট সবই অসম্ভব সবুজ । ফিকে নয়

তাজা সবুজ । ধানের শিষ আর নিবিড় জলাশয়ের দিকে চাইলেই মন ভরে যায় । তাই আমাদের পটভূমি ; গোলাপগড়ও এরকমই এক গ্রাম । গোলাপে ছাওয়া , মায়াবী লাল, নীল , গোলাপী এক উপলব্ধি ।

যথাসময় ওর বন্ধুরা এসে হাজির হয় গোলাপগড়ে ।

এই লোকালয়ের রূপে সবাই মজে যায় । কারো কোনো তাড়াহুড়ো নেই। মাটির রাস্তা , ধানক্ষেত , রঙীন পাখির ডাকের মাঝে কোনো কোনো বাউলের গান । একদম পার্ফেক্ট সিন্ আরকি ! সবাই হাসছে । গ্রামে যাওয়া তো আজকাল আর হয়না । যাদের বাড়ি আছে তারা যায় কিন্তু শহুরে লোকের যাওয়া সহজে হয়না । সেইসময় পাহাড়ে কিংবা সমুদ্রে ঘোরার প্ল্যান হয় ।

সে যাইহোক্-আজ সবাই এসেছে কৈশোরের বন্ধুর আহ্বানে । এখানে নাকি সবাই মাটিতে শোবে । লম্বা বিছানা পেতে । **সকালে মুড়ি/চিড়ে খাবে । দুপুরে আর রাতে ; পেট ভরে ভাত- ডাল- সব্জি এইসব । মাছ ।**

শেষপাতে দই আর মিষ্টান্ন ।

সাথে সাথে, নিজেদের জীবনের গল্প ভাগ করে নেবে ছয়জন। গুরুত্বপূর্ণ কোনো ঘটনা !!!

রাকা, রাজা, সোমা, মৃগেন, মিমি আর বয়।

এছাড়াও ওদের সঙ্গীরা আছে। আছে কারো কারো সন্তানও।

সারাটাদিন মস্তি করেই কেটে গেলো। গ্রামীণ টাট্‌কা মাছ ও সব্জি , সরু চালের ভাত , ডাল , গন্ধ-লেবু এইসব খেয়ে সবাই মজায় ছিলো।

বিকেল হতেই অনেকে একটু বেড়িয়ে এলো। অতি ভোজনের ঢেঁকুর তুলতে তুলতে। কেউ অচেনা কারো দাওয়ায় বসে একটু পান খেলো। কেউবা মোবাইলের সিগ্‌ন্যাল নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। আর কেউ কেউ, পথপাশের সবুজ ক্ষেতে নেমে- কচি শাক ইত্যাদি তুলতে লাগলো। চললো প্রচন্ড দাপটের সঙ্গে এই সবুজ অভিযান।অনেকে ঠাকুর তৈরি দেখলো। সামনে পুজো আসছে তাই। অনেকে- সোজা ইঁদারা নয় একেবারে ইন্দিরার কালোদিঘীতে নেমে, সাঁতার কেটে স্নান করলো আবার, বার বার ।

সবারই আজ ভারি মজা !! সবাই চায়, শেষ জীবনটা যেন এরকম কোনো শান্ত গ্রামে কাটে ।

সবার আগে রাকার গল্প শুনলো সবাই । রাকা যখন প্রথম ওর মোহিনপুরের বাড়িতে যায় সে অনেকদিন আগে ; তখন ওখানে মেয়েদের ভোট দিতে দেওয়া হতনা । মনে করা হত যে মেয়েরা অতি বোকা আর তারা ভোট দিলে সর্বনাশ হবে দেশের । তাই গ্রামের ভোটে ; ওদের ভোট দেওয়ার কোনো চল ছিলো না । ওখানে আশ্চর্যজনক ভাবে বাচ্চা ছেলেরাও ভোট দিতো- যারা ১৮ পেরোয়নি অথচ যুবতীরা ব্যালট্ পেপারে, শীলমোহর লাগানো থেকে বঞ্চিত হতো ।

কেন এরকম আজব নিয়ম চালু হয়েছিলো কেউ জানেনা । ওখানকার নারীরাও এসব নিয়ে চিন্তিত নয় । তারা স্বামী ও সংসার নিয়েই ব্যস্ত ।

খুবই অবাক লাগতো রাকার । কিন্তু কী করবে সে?

অশেষকে বললে সে বলতো যে বুঝতে পারছে ভালো করেই এটা অন্যায় কিন্তু তার করার কিছুই নেই । বাপ্-দাদুরা সবাই এই নিয়ম মেনেই কাজ করেছে । আসলে

কোনো এক নবাবের সময় থেকে এই প্রথা শুরু হয় । লোকেও মেনে নিয়েছে । তাদের আড়ম্বরহীন জীবনে, এই ব্যালট্ পেপারের ঘটনাটি নিয়ে কেউ আর উচ্চবাচ্য করেনি । যেন পুরুষ- বাড়ির বাইরে যেতে অভ্যস্ত কাজেই তারাই সামলাক দপ্তর , বাজার । এই আর কি ।

চিরটাকাল ভোট দিতে অভ্যস্ত রাকা অবাক হলেও স্থির করে যে এই নিয়ম বদলিয়েই ছাড়বে । ওর শ্বশুর মহাশয় বলেন যে বৌমা, কী করবে তুমি একা একা ? যুগ যুগান্ত ধরে এরা এসব নিয়ম মানছে । তোমার কথা কেউ শুনবেও না আর মানবেও না । বলবে শহুরে মেয়ের ক্ষ্যাপামো । সবাইকে শহরের লোক আর আধুনিক বানাতে চায় ।

তবুও রাকা নাছোড়বান্দা । এই আজব নিয়ম বদলাবেই সে । অশেষ তার সাথেই আছে কিন্তু জানেনা কী করে সম্ভব হবে এই নিয়ম পাল্টানো ।

সিগারেটে টান দিলো রাকা, গোলাপগড়ের ঘরে । হ্যাঁ, সে সিগারেট পান করে তাই ঠোঁট ঈষৎ পোড়া । তারপর ছাই ঝেড়ে নিয়ে বলে ওঠে :::একবার ভোটের সময় আমি ওখানে । তখন আমি প্রেগন্যান্ট । আমার বাচ্চা

হবে আর আমি ভোটও দেবো । একসাথে দুটো জিনিস হবে এখানে ।

ভোটের আগে তো আমায় কোনো কাগজ দেয়নি যাতে আমার নাম লেখা আছে । ভোটের পরে গণনার সময় দেখা যায় যে এগারোটা ভোট কম বলে জিততে চলেছে মুসলিম নেতা , হুসেন ভাই । সেখানে (মোহিনপুর) বছরে ;হিন্দু ও মুসলিম মতে উৎসব যুক্ত- দুটি ক্যালেন্ডার বের হয় । নববর্ষে , প্রতিবার ।

এই চত্বরে হিন্দু লোক বেশি আর হিন্দু রাজনৈতিক নেতাই ছিলো । যদিও কোনো কালে এখানে নবাবের আইন অনুসারে মেয়েদের ভোট গোনা হতনা তারা মূর্খ ও বোকা বলে । মেয়েদের মধ্যে অনেক ন্যাকা স্পেসিমেন থাকলেও, বোকা এরকম কী বলা যায় ?

সে যাইহোক্ ঐ মুসলিম নেতাকে ঠেকাতে পরামর্শ দিলো রাকা যে মেয়েদের ভোট নেওয়া হোক্ ।

গ্রামের ২৫জন নারীর ভোট নেওয়া হয় যারা এই ইলেকশান্ কমিটির অথবা নেতার পরিচিত । ভোটে জিতে যায় হিন্দু নেতা স্বরাজ মুখোপাধ্যায় ।

গোপন রাখা হলেও মিডিয়ার কানে চলে যায় এই সংবাদ । কাজেই লোকাল ভোট কমিশান- তখন জানায় যে এই ভোট নেবার আগে ওরা ওদের নিয়মাবলী শুধরে নিয়েছে

। সেইমতন কাগজপত্রও দেখায় তারা, মিডিয়ায় আর সরকারের কাছে । ফলতঃ ভোটগুলি গণনা করা হয়েছে জেনে কেউ কোনো আপত্তি করেনা । এর মধ্যেই ছিলো রাকার ভোট এবং সেটাই প্রথম ভোট । একজন নারীর দেওয়া প্রথম ভোট !

এরপর থেকে নিয়মিত মেয়েরা, ওখানে ভোট দিতে অভ্যস্ত । যদিও তারা ইলেকশান ময়দানে নেমেছে কিছুটা বাধ্য হয়েই আর এক অদ্ভুত ঘটনার সাক্ষী হয়ে তবুও আজকাল তাদের দেওয়া ভোটেই জিতে চলেছে নেতার দল ; এটা দেখে ও জেনে তারা অসম্ভব খুশি ।

মৃদু হেসে বলে ওঠে রাকা :: **জীবনে একটা ক্ষেত্রে অন্ততঃ আমি প্রথম হলাম । আমার নামটি হয়ত ইতিহাসে থেকে যাবে । আর কোথাও নাহলেও আমাদের ঐ মোহিনপুরের ইতিকথায় ।**

জোরে হেসে ওঠে অন্যরা । বিশেষ করে রাজা । কারণ এবার তার গল্পের পালা । এমন কোনো গল্প- যা তার জীবনের, সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ; বলেই রাজার মনে হয় ।

আগে রাজার বাস ছিলো বিদেশে । হোলিচাইল্ড নামক এক উন্নত দেশে । এইদেশে সবকিছুই দারুণ উন্নত । সবচেয়ে পিস্‌ফুল দেশ বলে লোকে জানে । ক্রাইম রেট অনেক কম । মানুষ অমানুষ নয় , উজ্জ্বল তাদের স্পর্শ । ভ্রমণের জন্যেও বিখ্যাত তবে অসম্ভব শীত ওখানে । হোলিচাইল্ড আগে ছিলো সাহেব অপরাধীদের চারণভূমি ।

ওখানে হার্ডকোর ক্রিমিন্যালদের রাখা হতো ।

এখন সেখানে আধুনিক সমাজ- আর ক্রাইম প্রায় নেই ।

এই হোলিচাইল্ড দেশে যখন রাজা যায় তখন সে নিতান্তই এক সাধারণ সেলস্‌ ম্যানেজার । দুনিয়া জোড়া নাম ; এরকম এক মোটর কোম্পানির, সেলসের লোক ছিলো সে। কাজেই যায় বিদেশে । কাজ শেষ হলে ভারতে না ফিরে অপরিচিত দেশে থেকেও যায় । । বড় সুন্দর ও মসৃণ জীবন এখানে । কেউ কারো ব্যাপারে মাথা গলায় না অথচ দরকারে সাহায্য করে । একটু পয়সা চেনে আর সেল্‌ফিশ অনেকে মনে করলেও রাজার ভালই লাগে ।

দক্ষিণ কলকাতার ছেলে রাজা, আসলে বাংলাদেশের লোক। খুব ছোট বেলায় ওকে নিয়ে আসে ওর বাবারা।

ওর দুই পিসি -সেই সময় হারিয়ে যায়। বর্ডার পার হতে গিয়ে। তারা আর বাসায় ফেরেনি। এদিকে মজার ব্যাপার হল---ওদের পরিবারের এক মুসলিম বন্ধু; নিজের বাড়িটা ওদেরকে দিয়ে, বাংলাদেশে চলে যায় সপরিবারে। নিজেদের ধর্মের মানুষ আছে বলে।

অদ্ভুত ঘটনা। ওদের তিন ভাইয়ের নাম শাহিন্, শামিম্ আর শায়ের। এরা বাংলাদেশে গিয়েও ওদের সাথে সম্পর্ক রেখেছিলো।

এদের বিরাট বাসাটায়, থাকতে শুরু করে রাজা ও তার পরিবার। কাজেই রাজার সবসময়ই নতুন দেশ ইত্যাদি দেখার একটা বাসনা ছিলো। আর যাই করুক না কেন সে বিদেশে যাবেই এরকম ভাবনা নিয়ে বেড়ে ওঠে। আর সব জায়গায় নাহলেও শাহিন্, শামিমেরা অনেক দেশেই আছে। বাংলাদেশীরা খুব দিলদরিয়া হয়। অচেনা লোককে পর্যন্ত তারা বাড়িতে তুলে আপ্যায়ন করে। তাই রাজার মনে আশা ছিলো যে বিদেশে গেলে এরকম কাউকে পেয়েই যাবে।

হোলিচাইল্ড দেশে যখন যায় তখন চাকরির ভরসা ছিলো । পরে চাকরি ছেড়ে দেয় । এই শীতল দেশে সবসময় একটা ঠান্ডা ভাব থাকে । বরফ থাকে । গরমকাল নেই প্রায় । বৃষ্টিও হয় খুব । সবাই ছাতা নিয়ে ঘোরে সবসময় । দোকানে , অফিসেও এক্সট্রা ছাতা রাখা থাকে ।

সেল্‌সের কাজ ছেড়ে দিলো রাজা । দেশেও ফিরলো না । বরং এক বাংলাদেশী দোকানে ঠাঁই পেলো । লোকটির নাম হুমায়ুন । হুমি বলে সবাই । সেই হুমির দোকানে, প্রথম চাকরিটা থাকতে টিফিন খেতো । সেখান থেকেই আলাপ । পরে যখন দেশে ফিরলো না তখন হুমি ওকে দোকানের গার্ড করে রাখলো । রাতে পাহারা দেবে ওখানে শুয়ে । খাওয়া ফ্রি । মাইনেপত্র নেই । মাসকয়েকের মধ্যেই কাজ খুঁজে নিতে হবে ।

এই দোকানে সমস্ত বাঙালি দ্রব্য মেলে । মাছ, সবজি, খাবার, তেল, নুন, মিষ্টি, নাড়ু, মোয়া, শুঁটকি মাছ, কচুর শাক, ইলিশ, রকমারি সাজের জিনিস , ক্যাসেট, সিডি , সিনেমা সমস্ত । এই দোকানে সারাদিন কাটতো । লোকাল বিজ্ঞাপন দেখতো ছোট কাজের জন্য । এমন কাজ যা করলে লং টার্ম ভিসা পেতে সুবিধে হবে ।

এইভাবেই হুমির এক খদ্দেরের সাথে আলাপ হয়, যে রাজাকে নিজের সংস্থায় কাজে নেয় । ওর কাজ হবে অ্যাম্বুলেন্স চালানো । এই সংস্থা, গোঁড়া মুসলিমদের হাসপাতালে নিয়ে যায় । যারা বারোয়ারি যানবাহনে করে চলাচল করা পছন্দ করেনা । বিশেষ করে রূপবতী নারীরা । কাজেই কাজ করতে অসুবিধে হবার কথা নয় রাজার । স্বেচ্ছায় নিলো চালকের কাজটি ।

যদিও সেল্‌স্‌ ম্যানেজারের থেকে অনেক নিচু পোস্ট তবুও রাজা আপত্তি করলো না । হুমিও ওকে এই বলে বোঝালো যে একেবারে কাজ না করার থেকে কিছু করা ভালো । এই কাজ করতে করতেই যোগাযোগ বাড়বে -- সঙ্গে নতুন কাজের সম্ভাবনাও। আর বিদেশে এসব নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না ।অসম্ভব উন্নাসিক না হলে । কাজেই রাজার উচিৎ এটা করা । রাজাও, অন্নদাতার কথা মেনে নিয়ে হাসি মুখে লেগে গেলো কাজে ।

কপাল বোধহয় একেই বলে !

একদিন রাতে, গাড়ি মানে মাঝারি সাইজের ভ্যানের মতন অ্যাম্বুলেন্সটা চালাতে চালাতে হঠাৎ আয়নার মাধ্যমে পেছনে তাকাতেই চক্ষু, চড়ক গাছ ! এক বিদেশিনী

রাজার দিকে চেয়ে হাসছে যার একটিও চোখ অথবা দাঁত নেই । নাকের ওখানটায় গর্ত , বড় বড় !

এই ভৌতিক চেহারা দেখে এতই ভয় পেয়ে যায় রাজা যে গাড়ি গিয়ে ধাক্কা মারে এক পাঁচিলে !

দূর্ঘটনায় ভালো চোট পায় সে । লোকাল ডাক্তার খানায় নিয়ে যায় পথচারীরা , পরে কোনক্রমে হুমির দোকান পানে ফিরে যায় । ব্যান্ডেজ দেখে হুমিও অবাক ! কী করে হল এতসব ?

গল্প শুনে সবাই ওকে গল্পই বললো । ঘটনা নয় । কারণ এরকম আজগুবি জিনিস গল্পেই থাকে ।

ঘরের সবাই বেগুনি, পেঁয়াজি, আলুর বড়া, কুমড়ো ফুলের বড়া, বাঁধাকপির বড়া, পালং শাকের বড়া খেতেই ব্যস্ত ছিলো । বাইরে ঘন আঁধার । চা ও টায়ে মুখ দিয়েই কথা হচ্ছিলো । অনেকেই ভয় পেয়ে যায় বিশেষ করে ছোটরা ! বড়রাও অনেকে একসাথে বলে ওঠে :: তারপর ?

চোখগুলো তাদের গোল গোল হয়ে গেছে !

সোমা প্রশ্ন করে :: তুই সত্যি ভূত সরি পেত্নী দেখেছিস্ নাকি রে ?

রাজা হেসে ওঠে । তারপর বলে ::: আর বলিস্ না । এরপর থেকে নিয়মিত দেখতে শুরু করলাম । একই মুখ ; আর সেই মুখ আমার বিদেশ বাসের বাসরশয্যা বিষে ডুবিয়ে দিলো । আমাকে লোকে সাইকো ভাবতে শুরু করে । উন্মাদ বলে । বলে যে ওগুলি আমার হ্যালুসিনেশান । মনের দরবারে ; অযাচিত দরবারি কানাড়ার বিচ্ছুরণ । কেউ আমাকে বুঝলো না , আমার কথা মানলো না , শুনলো না সত্যিটা কী , কেন । আমাকে মেন্টাল ওয়ার্ডে দিয়ে এলো । হুমি আর সেই গাড়ির মালিকেরা সবাই মিলে । ওখানে আমাকে আটকে রাখা হল । আমার ওপরে- মেন্টাল রোগের নানান নতুন ওষুধ ; পরীক্ষা করতে লাগলো । সুস্থ মানুষকে পাগল করার ব্যবস্থা আর কি ! তবে একজন পাকিস্থানি চিকিৎসক আমাকে একদিন বলেন :: আমি তোমার ব্যাপারটা বুঝতে পারছি । তুমি হয়ত কোনো জিন-পরী দেখে থাকবে । এদেশের বেশিরভাগ মানুষ, এসব প্রাচ্যের ধর্মীয় জিনিস ও সংস্কার বোঝেনা আর মানেনা । তাই তোমাকে ওরা উন্মাদের লেবেল দিয়ে চিকিৎসা করার চেষ্টা করছে । কিন্তু আমি বুঝেছি যে তুমি সত্যিই এরকম কোনো প্রেতিনীকে দেখেছো । এসব পাবলিক্লি বললে লোকে তোমায় মেন্টাল ওয়ার্ডেই দেবে, এইদেশে !

তারপর এই পাকিস্থানি চিকিৎসকের দয়ায় আর তৎপরতায় আমি মুক্তি পাই । তবে নজরে রাখবে কিছুদিন এরকম বলে । পরে সুস্থ মনে হলে আমাকে ছেড়ে দেয় ওরা । সেখানেও ঐ চিকিৎসক নিজে দায়িত্ব নিয়ে রিলিজ লেটারে সই করেন । ওঁর কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ । এরপর আমাকে সরকার থেকে দয়া দেখিয়ে একটা ট্যাক্সি কিনে দিলো । সারাদিন ট্যাক্সি চালাই আমি । রাতে ট্যাক্সি চালকদের একটি মেসে থাকি । অসম্ভব পুরোনো একটা দোতলা বাড়ি । সেখানে কম দামে খাবার বিক্রি করে এক এন-জি-ও ; যারা লোকাল ট্যাক্সি চালকদের সুস্থ ও সজীব রাখার ব্রত নিয়েছে । সারথী সুস্থ না হলে , তার দৃষ্টি ক্ষীণ হলে যাত্রীদের সমস্যা ও বিপদ হবে । তাই ঐ সংস্থা আমাদের মতন চালকদের দেখাশোনার ভার নিয়েছে ।

সেখানে থাকতে থাকতেই দ্বিতীয়বার সেই মুখ দেখি ! একদিন অনেক রাতে আমি অন্যশহর থেকে ফিরছিলাম । তখন দেখি যে সেই মহিলা পেছনে বসে আছে অন্য যাত্রীর পাশেই ! এবার ভয় পেলেও আমি কাউকে বলি না । আর সেই যাত্রী হঠাৎ আমাকে গাড়ি থামাতে বলে । চিৎকার করে ওঠে ! পরে জানা যায় যে সে নাকি দেখেছে সামনের আয়নায় , এক মহিলা তার পাশে বসে আছে , বোরখা পরা । হঠাৎ মুখের ওড়না সরাতেই দেখে চোখ, নাক , দাঁতহীন এক মুখ !

আমাকে জিজ্ঞেস করে যে আমি সেই মহিলাকে দেখেছি কিনা ! আমি কোনো উচ্চবাচ্য করিনা ।

এই ঘটনার পরেই বুঝি যে আমি অসুস্থ নই । একদম সুস্থ । ঐ লোকটির তো আর আমার মতন মাথার ব্যামো নেই ; তাহলে ও কী করে দেখলো সেই মুখ ? **ভয়াবহ, ভয়াল মুখ-গহ্বর ?**

যদিও প্রকাশ্যে আমি স্বীকার করিনা যে আমিও ওকে দেখেছি । বার বার মেন্টাল ওয়ার্ডে গেলে সত্যি পাগল হয়ে যাবো । তাই ওকে মিথ্যেই বলি :: নাহ্ তো !

এরপরই নিজের মনোবল ফিরে পাই আর দেশে ফিরে আসি । বুঝতে পারি আমি উন্মাদ নই । আমার চিন্তা শক্তি ও স্নায়ু একেবারে রাইট সিগ্ন্যাল দিচ্ছে । তখনও দিয়েছে । অন্যরা মানেনি । মনোবল ভেঙে পড়েছিলো তাই । সবসময় ভয়ে থাকতাম, হয়ত আমার কোনো আচরণের জন্য, লোকে আমাকে বদ্ধ ভাবছে । প্রতিটা ব্যবহার --বিচার করে দেখতাম যে লোকে আমাকে অসুস্থ মনে করতে পারে কিনা এরজন্য !

পরে বুঝলাম যে নাহ্ ! আমি একেবারেই সুস্থ, সবল আর মাথাও পরিস্কার আমার । পাগলামির ছিঁটে ফোটাও নেই কোনো । কাজেই দেশেই ফিরে আসি- নিরাপদ আশ্রয়ে । বুঝি, পরবাস সবার জন্য নয় । নীলার মতন ।

কারো সয় কারো সয়না । আমার প্রবাসী জীবনের আকাশ মেঘে ঢাকা । আকাশী নীল হলনা , ফুরফুরে বাতাসও বইলো না । বরং লোকে আমাকে পাগলা গারদে পুড়ে দেয় ! তাই এখন ভালো আছি । আনন্দে আছি । বুঝেছি স্বপ্নপূরণের জন্য বিদেশে না গেলেও চলে । শুধু নিজের স্বপ্নকে ছুঁতে গেলে যা করতে হবে- দেশে বসেও সম্ভব কিনা সেটা একবার যাচাই করে দেখতে হবে । যেখানে আমি সবকিছু ছেড়ে যাচ্ছি , সেই দেশ আমাকে গ্রহণ করবে কিনা তাও ভেবে দেখার বিষয় । সব দেশ কিন্তু সবার সহ্য হয়না । বিদেশবাসও একটা অভ্যাস আর প্যাটার্ন এর মাধ্যমে চলে । কেউ নিতে পারে, কেউ পারেনা । আমার ক্ষেত্রে ফলাফল ; নেগেটিভ হল ।

কাজেই স্বভূমিই আমার জন্য ভালো । তাই এখানেই থিতু হলাম ।

চায়ের পেয়ালা ভরে দিয়ে গেলো কাজের লোক ।

বাইরে গাঢ় আঁধার । একফালি চাঁদের মুখ দেখা যাচ্ছে । হয়ত রাতপাখির ডাক আর অচেনা কোনো পশুর শিস্ ঘরটাকে মোহময় করে তুলেছে ।

অল্প আলোয়, মায়াবী লাগছে গোলাপগড়ের অট্টালিকা !

আর এলোকেশে জানালার পাশে দাঁড়িয়ে সোমা ।

কেমন প্রেতিনী মনে হচ্ছে ওকে । ও নাকি দীপাবলীর সময়, ভূত চতুর্দশীর রাতে সবাইকে ভূতের গল্প বলতে বলে কিন্তু আজ যা শুনলো সেটা বাস্তব । এরকম আগে শোনেনি । তাই নিজেই প্রেতিনী হবার চেষ্টা করছে, সত্যের তলানিটা খুঁজে পেতে ।

সোমার কাহিনীতে কিন্তু কোনো প্রেত নেই । তবে মৃত্যু আছে ।গল্পটি তার বোনের । নাম শম্পা । শম্পা, সোমার চেয়ে অল্প ছোট ছিলো । দুই বোনের অসম্ভব মিল । যমজ বোনের মতন । ওদের বাবা ছিলেন সেনাবাহিনীতে ; তাই ওরা কম বয়সেই অনেক প্রদেশ ঘুরেছে । ঝরঝরে ইংরেজি পারতো ।

বাবারও ; ইংরেজি খুব ভালো ছিলো । ওদের আর্মি ঘাঁটিতে লোকেরা-- ইংরেজি চিঠি লেখানোর জন্য সোমার বাবার কাছেই আসতো । ভদ্রলোক ; রাশিয়ান ও জার্মানও জানতেন । তবে কোনো বড় অফিসার ছিলেন না । সাধারণ কাজ করতেন । চেয়েছিলেন, দুই মেয়েই অনেক লেখাপড়া করে ভালো ভাবে মানুষ হোক্ !

বাস্তবে সোমা কলেজে পড়ায় । সে সয়েল কেমিস্ট্রি নিয়ে পড়েছে । এম-এস-সি পাশ । গবেষণাও করেছে তবে শেষ করেনি । বাচ্চা হল বলে ।কিন্তু ওর বোন শম্পা ; ছিলো ফাঁকিবাজ । লেখাপড়ায় মন ছিলো না ।

কোনোরকমে গ্রাজুয়েট হল । পরে কম্পিউটার শিখে একটা ছোট সংস্থায় ফ্যাকাল্টির কাজ পেলো । অল্প মাইনে । বাবা ওর বিয়ে দিয়েই দিলেন । পাত্র সরকারী কাজ করে । যদিও ক্লার্ক । ঘুষও নিতো । সেই ঘুষের টাকায় একটি বড় বাড়ি কেনে । পুরোনো বাড়ি । বাড়িটা ক্রমশ ভেঙে পড়তে লাগলো । বড় শহরের কাছেই বলে পলিটিক্যাল পার্টির লোক এই বাড়ি দখল করার সবরকম চেষ্টা করতে শুরু করে । তারপর আসে বিল্ডিং বানানোর লোক । প্রোমোটর । কিন্তু উপযুক্ত দাম না পাওয়ায় ওরা বিক্রি করতে রাজি হয়না । পাঁচ কোটি পর্যন্ত দাম উঠেছিলো । তবুও মন গললো না , শম্পার বরের ।

লোভ যাকে বলে । অনেকবার বারণ করা সত্ত্বেও ওরা বাড়ি দখল করে বসেই থাকে । শেষকালে শম্পার স্বামী প্রতুলকে, গুলি করে মারে প্রমোটারের গুন্ডা বাহিনী । এরা নাকি নবনির্মিত ফ্ল্যাটেই থাকে । যদিও বাইরে সবসময় সিকিউরিটির বাহুল্যে লোকে বিরক্তই হয় ।

সময়মতন , বিল্ডার ওদের ব্যবহার করে থাকে ।

শম্পা ; তবুও শ্বশুরের ভিটে নাহলেও স্বামীর দুনম্বরী টাকায় কেনা এই বাড়ি ছাড়ে না । নিজে লেখাপড়া শেখেনি তাই পরিবারের সবাই ,সবসময় ওকে অগ্রাহ্য করেছে । **----এই একটা ফ্যাকাল্টি , ঐ সামান্য বেতনের কাজ করে , কম্পুটার না কি এক মেশন চালানো শেখায় !**

এইসব শুনে শুনে কান পচে গেছে । তাই মেয়েকে ইঞ্জিনীয়ার বানাবেই সে ! বাড়ির পাশেই প্রাইভেট কলেজ । সেখানে যাতে মেয়ে উজ্জয়িনী চান্স পায় তার জন্য কোনো কিছুই করতে বাকি রাখেনা শম্পা । স্বামী মারা গেলে সরকারি কাজও পেয়ে যায় । একমাত্র মেয়ে উন্নি-কে নিয়েই তার সব স্বপ্ন । সে যা পারেনি তাই করে দেখাবে তার আত্মজ । কাজেই রূপকথা রচনা করতেই, সে পতি বিয়োগের ব্যাথা বুকে নিয়েই ঐ বাসায় থেকে যায় । একটা খুনেও কাজ হলনা দেখে ততদিনে বিল্ডার হাল ছেড়েছে আর তখন পুলিশের তদন্তও চলেছে ।

ঐ রাস্তায় নাকি পুলিশ বসেছে । যাতে এইরকম ঘটনা আর না ঘটে ।

ভাঙাচোরা ঐ বাড়িতে দুই নারী । এক যুবতী আরেক কিশোরী ! দুজনের সংসার । পুরোনো বাড়ির ছাদ ধ্বসে

পড়ে তো গেট ভেঙে যায় । দরজা নড়বড়ে । মেঝেতে বৃষ্টির জল জমে যায় । ছাদ ফুটো হয়েছে ।

টয়লেটের দরজা ভেঙে পড়েছে । এত অর্থ নেই শম্পার যে পুরো বাড়ি সারিয়ে তোলে ! আর মেয়েকে ঐ কলেজেই পড়াবে । চেনাশোনা আছে । হয়ে যাবে । অন্য কোথাও গেলে, মেয়ে হয়ত কোথাও চান্স পাবেনা আর দূরে হলে একা যেতেও পারবে না । বাবা নেই । খুন হয়েছে । একটু ভয় তো থাকেই । কাজেই বহুবার বলা সত্ত্বেও সোমার বোন শম্পা , ঐ বাড়ি ছাড়েনা ।

বেশ কয়েক বছর পরে মেয়ে ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে ঢোকে, প্ল্যান মাফিক । কম্পিউটারে পায়না । অনেক মার্কস্ লাগে । সিভিলে পায় । পড়তে শুরু করে কিন্তু বাবার সাথে মাকেও হারায় ! এক দূর্যোগের রাতে ঐ বড় বাড়ি ভেঙে পড়ে শম্পার ঘাড়ে ! মেয়ে সেদিন বন্ধুর বাসায় ছিলো বলেই বেঁচে যায় ।

উজ্জয়নীর অবশ্য ক্ষোভ আছে যে সে থাকলে মাকে বাঁচাতে পারতো । লোকে জানতেই পারেনি যে শম্পা চাপা পড়ে গেছে ওখানে !

এখন উজ্জয়িনী বা উন্নি ; ঐ বাড়ি অন্য এক বিল্ডারকে দিয়ে দিয়েছে । বদলে পেয়েছে দুটি কেতাদস্তুর ফ্ল্যাট আর

নগদ টাকা । ইঞ্জিনীয়ারও হয়েছে ।বড় চাকরি করে । কিন্তু বাবা-মাকে চিরকালের মতন খুইয়েছে ।

যদি আগে ওরা বিল্ডারের শরনাপন্ন হয়ে একটু কম টাকাতেই রাজি হতো তাহলে এইদিন দেখতে হতনা উন্নিকে । কিন্তু কপালের লেখা কেই বা পাল্টাতে পারে ? ওর মাও বাড়িতে কাউকে হাত দিতে দেয়নি । বিশেষ করে বিল্ডারদের । ওর স্বামীকে হত্যা করেছে বলে । সব প্রমোটারই নাকি সমান । কিন্তু শেষ অধ্যায় এলে দেখা গেলো যে বিল্ডারের তৈরি বাসাতেই থাকতে হচ্ছে উজ্জয়িনীকে । তাদের দেওয়া সমাধান মাথা পেতে নিতে হচ্ছে কারণ সে বড় একা । আর পারছে না এতসব বোঝা বইতে ।

--টাইমিং খুব ইম্পোর্ট্যান্ট বুঝলি সোমা ? বলে ওঠে মৃগেন । শর্টে বা আদর করে ওরা বলে মিগু ।

এবার সবাই মিগুকেই ধরেছে তার জীবনের গল্প মেলে ধরার জন্য । আর এককোণায় দাঁড়িয়ে কাঁদছে উন্নি । ওর মাথায় হাত দিয়ে, ওকে শান্ত করছে সোমা । সেও এসেছে মাসির সাথে- এই আসরে । খুব বেড়ায় সে । মন ভালো থাকে । স্বাধীনচেতা মেয়ে বলে মোট সাতটি রিলেশানশিপে জড়ালেও আজ অবধি একটিও টেঁকেনি ।

ও বলে ওর মাসি সোমাকে :: আমি মেয়ে বলে বরের পা টিপবো আর আমার পা ব্যাথা হলে বর টিপবে না এসব আমি মানতে রাজি নই ।

সোমা বলে :: একটু নরম ও সহনশীল নাহলে বিয়ে শাদি হলেও টিঁকবে না ।

ভিন্নমতে বিশ্বাসী উন্নি বলে ওঠে :: কম্প্রোমাইজ করবে দুই পক্ষই । কেবল মা কিংবা বৌ কেন ?

মেয়েরা আর কত সহ্য করবে ? নিজেদের জন্য নিজেদেরই বলতে হবে নাহলে নিষ্ঠুর পুরুষ এক চিলতে জমিও ছাড়বে না ।

ইদানিং সবাই একবাক্যে মেনে নিয়েছে যে উন্নি একজন সেল্ফ প্রক্লেম্ড্ ফেমিনিস্ট ।

উজ্জয়িনী অবশ্যি বলে :: আমি ইস্টও না ওয়েস্ট-ও না । আমি যা উচিৎ মনে করি তাই বলি । আমার মনের কথা খুলে বলতে আমি ভালোবাসি । আমার বই পড়ে বুদ্ধিতে শান দেবার দরকার নেই । নিজের বুদ্ধি যথেষ্ট আছে আর তাই দিয়েই আমি বিচার করি নানান ঘটনার আর উত্তর দিই । একে ফেমিনিস্ট বা মেল- শভিনিস্ট যাই বলা হোক্ না কেন । যদি দেখি পুরুষদের ওপরে খড়্গ-হস্ত হচ্ছে সমাজ, তখনও আমি মতামত দেবো । **আর টুইটারের যুগে আমাকে কেউ এডিট করতে পারবে ?**

পরের গল্প বলার দায়িত্ব পেয়েছে মৃগেন বা মিশু । মৃগেন অবশ্য বলে যে এটা এমন একটা ঘটনা যা ওকে বিচলিত করেনি, করেছে মোহিত । নিজের বিধবা মাকে নিয়ে ঘটনাটা । সুন্দর এক শালগাছে ছাওয়া ,ড্যামের দিকে মা থাকতো । মায়ের নামও ছিলো ময়ূরাক্ষী । সেই গল্প বলার আগে মিশু সবাইকে অনুরোধ করলো ডিনার খেয়ে নিতে । কারণ গল্প বলতে বলতে অনেক রাত হয়ে যাবে হয়ত ! আর খালি পেটে গল্প শুনতে কেউ আগ্রহী হবেনা তা যত ভালো কাহিনীই হোক্ না কেন ! আদতে তো বাঙালী ! ভোজন না করে ,শুধুই গল্প উৎপাদনে কেউ মজা পাবেনা তেমন-- কাজেই শীঘ্রম্ ভোজনম্ !!!

মিগুর গল্প খুবই আজব । তার কাহিনী নিজের মাকে নিয়ে । খুব ছোটবেলায় ওর বাবাকে হারায় মিগু । তারপর অভিনেত্রী শকুন্তলা বড়ুয়ার মতন দেখতে- তার মা ময়ূরাক্ষী বা ডাকনাম কাজল, ওকে নিয়ে নিজের বাবা ও মায়ের সাথে থাকতো । একটি গ্রামীণ স্কুলে চাকরি পায় । বায়োলজি পড়াতো সেখানে । টিচার হিসেবে বেশ জনপ্রিয় ছিলো । মিগু থাকতো শহরে , দাদু দিদিমার সঙ্গে । তার লেখাপড়া যাতে উন্নতমানের হয় তাই তাকে শহরে রাখা হয় । মা কাজ করে অর্থের যোগান দিতো । পিতৃহীন হলেও মিগুর স্নেহ, ভালোবাসার কোনো অভাব ছিলোনা । দাদু ও দিদিমা তাদের নাতিকে নিয়ে খুশী ছিলেন । রইলো বাকি মামা ! মামা একটি গুদামে হিসেব লিখতো । সেখানে কিশোর বয়স থেকেই মিগুকে নিয়ে যেতো । বলতো ::: ওরে বেটা ! তুই আমার বেটা রে ! লেখাপড়া করে মোটরগাড়ি চড়বি কিন্তু আমার সাথে গুদামে বসলে জীবনের বই পড়া হয়ে যাবে । দেখবি, বুঝবি সিস্টেমটা কীভাবে চলে । বুক কিপিংটা শিখে নিলে পরে সুবিধে হবে ।

এইভাবেই জীবনের পাঠ নিতে শুরু করে মিগু । আস্তে আস্তে বড় হতে শুরু করে । ওর মা, প্রতিবারই শহরে এসে ওকে একটা বিশাল গাছের পাতা দিয়ে যেতো । পাতাটিতে ; অজস্র ছোট পাতা । বলতো যে সব পাতা ঝরে গেলে আমাকে ফোন করিস্ !

এইভাবে শুকনো পাতা ,ঝরার অপেক্ষায় থাকতো মিগু । যেদিন পাতাগুলি সমস্ত ঝরে পড়তো সেদিন মাকে ফোন করতো !

তারপর লেখাপড়া করে যখন চাকরি নিলো তখন মাকে বললো অবসর নিতে । মায়ের ; অল্প কয়েক বছর বাকি ছিলো রিটায়ার হতে ।

আগে তো প্রতিটা পুজোতেই সে গ্রামে যেতো মায়ের কাছে ,গ্রামীণ পুজো দেখতে । জমিদার বাড়ির পুজো হতো ।

জমিদারের সাথে যাদের সারাবছর কলহ ইত্যাদি হতো তারা বছরের এইসময় পুজোর কাজ করে জমিদারের লাল চক্ষু থেকে মুক্তি পেতো । যারা কোনো কাজে অংশ নিতো না তাদের আবার হেনস্থা শুরু হতো পুজোর পরে । কাজেই পুজোটা ছিলো একধরণের আত্ম জাগরণের উৎসব । গ্রামের পুজোই বেশি ভালোলাগতো মিগুর । ওখানে একটা প্রাণের স্পর্শ ছিলো । পুজোটা , পুজোর

মতনই । ফাংশান নয় । কবজি ডুবিয়ে পাকা রুই এর ঝোল, পাঁঠার মাংস, ভাত আর টাট্‌কা রসগোল্লা খাওয়া সেই আগেকার দিনের মতন খুব ভালোলাগতো মিগুর । পুজোর ফাঁকে পিৎজা, পাস্তা আর চিকেন টিক্‌কা - নান্‌ খাওয়ার থেকে একেবারেই আলাদা ।

আর কাশ ফুলের বন, রেল লাইন ও মাটির ঘর, ধানের গোলা, নারকেল নাড়ু, মোয়া, তিলতক্তি এগুলোও ভীষণ টানতো ।

সে যাইহোক্‌ -একবার কানে এলো যে মায়ের নাকি গ্রামে এক বয়ফ্রেন্ড হয়েছে তাই চারদিকে ঢি ঢি পড়ে গেছে । এখানে সবাই সবাইকে চেনে । কাজেই শহুরে স্কুল টিচার এই গ্রামে পড়াতে এসে, এসব কী আরম্ভ করেছে তাই নিয়ে লোকের মুখে মুখে নানান কুৎসা রটেছে । গল্পের পর গল্প শোনা যাচ্ছে । কেউ ওদের একসাথে দেখেছে , কেউবা রাত কাটাতে দেখেছে আবার কেউ এলোমেলো চুলে ওর মাকে, অত্যন্ত অশ্লীলভাবে তার প্রেমিকের কোলে দেখেছে ।

এইসব নানান কথা শুনে মিগু ভেঙে পড়ে । এক তো নিজের মায়ের কেচ্ছা শুনতে কোনো সন্তানেরই ভালোলাগে না - উপরন্তু এখন মায়ের অবসর নেবার কথা কাজেই এই ঘটনায় জল কোনদিকে গড়ায় সেটাও দেখার বিষয় । তবে ওর মামা তো ওকে জীবনের নৌকো বেয়ে

যেতে শিখিয়েছিলো, তাই চরম স্রোতেও সে মসৃণভাবে তার ডিঙি বেয়ে চলার চেষ্টা করে ।

সোজা গিয়ে হাজির হয় ঐ গ্রামে । ঘটনার সত্যতা যাচাই করতে ।

এইসময় সোমা বলে ওঠে ::: কারো মা চরিত্রহীনা- এটা শুনলে তার কেমন লাগে বলতো ? আমরা সবাই তো ভাবি যে একমাত্র আমাদের নিজেদের বাবা ও মা ছাড়া সবাই সেক্স করে তাই না ? মায়ের বয়ফ্রেন্ড, বাবার গার্লফ্রেন্ডকে সত্যি সত্যি কি আমরা মুক্ত মনে মেনে নিতে পারি ? বল দেখি ?

মিঠাপান মুখে পুড়ে মিমি বলে ওঠে, তারপর ক্লাইমেক্স এসে গেছে ! কী হল রে মিগু , এরপরে ?

মৃগেনও পান নিয়েছে তবে মিঠা নয় নর্ম্যাল পান । ওর মতে মিঠাপান শিশুরা খায় । মুখের পিক্‌টা ফেলে আরো একটু জর্দা নিয়ে বলে ওঠে ::: পান খাওয়া ইজ্ ইন্‌জুরিয়াস্ টু হেলথ্ ! ইট কজেস্ মাউথ ক্যান্সার -- টিং টং !!!

--আরে দূর তোর অ্যাড । তারপর কী হল বলবি তো ? বিরক্তি প্রকাশ করে মিমি ।

মুখের পানকে ট্যাকেল করে আবার বলে ওঠে মিগু :::

আমি গিয়ে দেখি সবই সত্যি ।

চোখ দুটো ছানাবড়া করে মিমি আঁৎকে ওঠে , বলিস্ কী ? জমে গেলো । রোমান্টিক থ্রিলার একেবারে ।

--অসম্ভব চ্যাংড়া তুই মিম্ ! সবসময় রক্ মোডে , চ্যাংড়ামো বন্ধ কর । উনি তো তোরও মাতৃ-স্থানীয় ।

বিদুষী ও সমাহিত রাকা বলে ওঠে ।

-সো হোয়াট ? আমি তো ঘটনা জানতে চাইছি, স্ক্যান্ডেল না । উনি করছেন তাতে কিছু না আমি বললেই চ্যাংড়া ?

দুইপক্ষকে তোয়াক্কা না করে বলে চলে মৃগেন ----

মায়ের বয়ফ্রেন্ড হয়েছে একটি । তার নাম মিহির মল্লিক । মিহিরের দুই মেয়ে । ইলিনা আর ইলোরা । তাদের বিয়ে হয়ে গেছে । স্ত্রী মারা গেছে । মজার ব্যাপার হল আধুনিকা ইলিনা আর ইলোরাই তাদের বাবার জন্য এই গার্লফ্রেন্ডের সন্ধান করেছে ও মাকে জুটিয়ে দিয়েছে । দুজনেই একা । আর একসাথে হলে দুজনের ভালো লাগবে । ইলিনা আর ইলোরা দুজনেই মায়ের স্কুলের মেয়ে । ছাত্রী । মাকে সবাই পছন্দ করতো । মা ছিলো বিদুষী আর একই সাথে পাকা রাঁধুনি । তাই লোকে খুব কেয়ার করতো । পিকনিকে ; মায়ের হাতের বেগুন পোস্ত আর ধনেপাতা দিয়ে চিকেন/হাঁস সবাই পছন্দ করতো ।

কাজেই মাকে ওদের সৎমা রূপে পেয়ে ওরা ভারি খুশী । আমার সাথে আলাপও হল মেয়ে দুটির । মায়ের বয়ফ্রেন্ড মিহির কাকু, যাকে আমি মিহিকা বলে ডাকি উনি এক অসম্ভব দরদী মানুষ । কাজ করতেন সরকারের একটি পর্যটন দপ্তরে । পরে নাটক লিখতেন । সাধারণ মানুষের সুখ দু:খ নিয়ে । জীবন সম্পর্কে অনেক অভিজ্ঞতা ওনার ।মা আমাকে বলে যে ওরা দুজনে একসাথে থাকে কিন্তু সেই সম্পর্কটা একেবারেই স্পিরিচুয়াল । বন্ধুত্বের সম্পর্ক । ডিপ ফ্রেন্ডশিপ্ যাকে বলে । একে অন্যের সান্নিধ্য উপভোগ করে । এই বয়সে দৈহিক কোনো আশা আর কেউ করেনা । গভীর বন্ধুত্ব আর নির্ভর করার মতন একজন মানুষ---- এইভাবেই ওরা পরস্পরকে দেখে ।

সত্যি , আমি যে কদিন ওদের সাথে ছিলাম তখন দেখলাম যে মিহিকা আর আমি এক ঘরে আর ইলোরা ও মা অন্য ঘরে শুলো । সকাল থেকে উঠেই একটা রমরমা ভাব বাসায় । আসলে বিকেলের মরা রোদে আমরা নৌকায় করে সান্ধ্য পিকনিকে যাবো । নৌকোতে রান্না হবে দুপুরে ।সন্ধ্যায় খাওয়া হবে ।

এখানে সকালে, মিহিকা পুজোর ডালি সাজিয়ে দেবতার চরণে তাজা ফুলমালা দেন । মা অন্যদিকে বসে মালা গেঁথে দিচ্ছে । এইরকম । হোলিতে আরো মজা । সবাই

সবাইকে রং দিচ্ছে । ইলোরা ওর বাবার গালটা টিপে দিলো । বললো :: বাবা বলো কেমন লাগছে এখন !

আসলে আমি যা বুঝলাম তা হল এই মিলন হয়েছে সমুদ্র আর নদীর মিলনের মতন । এই মোহনায় কোনো কাদা বা ময়লা নেই । তীব্র বেগে বইছে ঢেউ । মিশে যাচ্ছে তার নাগর- সাগরের বুকে । আমি দেখলাম যে একই বাসায় , একই ছাদের তলায় বাস করলেও মিহিকা আর মায়ের জীবন অসম্ভব পরিষ্কার । আয়নার মতন মুখ দেখা যাচ্ছে তাতে । মিহিকা আর মায়ের জীবনে কোনো কালি নেই , নেই কোনো ছল কপটের বালাই । যেন অন্য কোনো গ্রহ থেকে , নীহারিকা থেকে দুটি পরিযায়ী পাখি এই গ্রামে এসে ঘর বেঁধেছে । নিপুন , নির্মল এক ঘর--যাতে এক বিন্দুও ময়লার ছাপ নেই ।

আমরা সময়ে বাঁচি । একের পর এক সময়ের ঘন্টা আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে আমরা বেঁচে আছি । কিন্তু মা ও মিহিকা যেন সেই সময়কেই ভেঙে ফেলেছে । সবুজ আতর মুছে সেখানে নিয়ে এসেছে আঁজলা ভরে রং বৃষ্টি!! এই অদ্ভুত সম্পর্কের কথা শুনে আমরা আগেই নাটক /নভেলের কথা ভেবে আঁৎকে উঠি !

--- ওরে বাবা , তাহলে কি আমার শুদ্ধ গৃহকোণ হারালো তার পরিচ্ছন্নতা ? সমাজের উল্টোদিকে কেন নৌকো বেয়ে গেলো আমারই রক্তমাংস ? কেন ? আমারই ঘরে কেন

ভেঙে পড়লো আর্শি ? কেন চুরমার হয়ে গেলো নির্মল প্রতিফলন ?

কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখলাম যে এই সম্পর্কে কোনো কালিমার স্পর্শ নেই তার কারণ এখানে কেউ কারো কাছ থেকে কিছু আশা করছে না । শুধু দুজনে একসাথে আনন্দে থাকে ; তাই এই সহবাস । মধুময় দিনযাপন ।

মাকে, তবুও আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম । সংস্কার বশতঃ। বলেছিলাম যে কেন মা এই বয়সে একজন অন্য পুরুষের সাথে থাকছে । মায়ের কি লোকলজ্জার ভয়ও নেই ?

শুনে মা খুব হেসেছিলো আর বলেছিলো -- ওসব বস্তাপচা থিওরি ছাড়ো । লোকের কথায় কান দিও না । চূড়ান্ত বাস্তবে থেকে থেকে ,ওরা গল্প তৈরি করতে ভালোবাসে । নদী যখন সাগরের কাছে এসে পড়ে তখন তার আর নিজস্ব বলে কিছু থাকে না । মোহনাই তার আবাসস্থল হয়ে ওঠে আর অনিচ্ছা সত্ত্বেও মিশে যেতে শুরু করে সমুদ্রের নীলাভ গভীরতায় ।আমাদের সম্পর্ক একটি কাঁচের ফুলদানির মতন ।

দুটি ফুল ফুটেছে সেখানে । বাইরে থেকে সব দেখা যাচ্ছে । আর মিহিরের সাথে আমার সম্পর্ক একজন মানুষের সাথে অন্য মানুষের , সুস্থভাবে যা সম্পর্ক হতে পারে তাই । নারী ও পুরুষ মানেই যৌনতা অথবা কলঙ্ক এগুলো হল অত্যন্ত নিম্নস্তরের মানুষের ভাবনা ।

শুনতে ভালোলাগে না এসব । আর তোমার মুখে একেবারেই শোভা পায়না কারণ তুমি আমার সন্তান । আর আমি- আমার মতন জীবন কাটিয়েছি,তুমি তো জানো ; কারো চোখ রাঙানি বা শাসনকে অগ্রাহ্য করে । হয়ত আরো অনেক মানুষ একদিন এইভাবে ডিপ ফ্রেন্ডশিপে যাবে । নিজেদের, সমস্ত সামাজিক সম্পর্ক যেমন ভাইবোন, স্বামী-স্ত্রী আর যৌনতার বাইরে নিয়ে যেতে সক্ষম হবে, একলা না থেকে তাদের জীবনকে সুগ্রন্থিত করবে । গ্লাস ডোরকে ভেঙে বেরিয়ে যাওয়ার নামই ফ্রিডম্ । মুক্তি । আর তার জন্য কোনো শীলমোহরের দরকার নেই । ফ্রিডমের জন্য সার্টিফিকেট লাগেনা , এমনই তার মাধুর্য্য ।

দুজন মানুষ এমনিই একসাথে থাকতে পারে , জোট বাঁধতে পারে । এরজন্য কোনো বিশেষ সামাজিক সম্পর্কের আওতায় না পড়লেও- তা স্বীকৃতি পেতে পারে । আর কে কিসে সুখী হয় কে জানে ?

অন্যের ক্ষতি না করে ; যদি নিজে আনন্দে থাকা যায় তাহলে মন্দ কী?

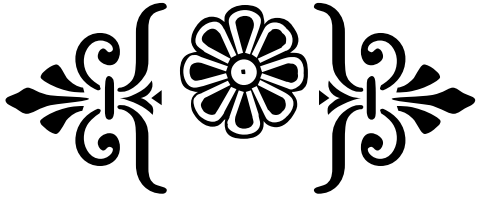

এবার ছোট্ট ব্রেক্ । হাল্কা জলযোগ আর চা । সঙ্গে সবাইকে একটি করে টাট্কা চাঁপা ফুলের কলি । একটু রাবিন্দ্রিক ধাঁচে । কাদ্মবরী দেবী বগলে ধূপের ধোঁয়া দিলেন , চুলে ইরাণী আতর --টাইপ্ আর কি । ঘরে আগে ধুনো দেওয়া হয়েছে মশার ভয়ে । এবার এলো চন্দন ধূপ ! স্বর্গীয় আভায়- লাজুকলতা মিমি ! একটু আগেই বকা খেয়েছে তাই রেট্রোগ্রেড মার্কারি ; জন্মছকে থাকা মানুষের মতন কথায় সাবধানী । কে যেন একবার বলেছিলো ; মানুষ সবকিছুতে গরীব হতে পারে কিন্তু কথায় গরীব হবার তো প্রয়োজন নেই ! কথার খেলা সবার জন্মগত অধিকার । আর আজকাল তো এস-এম-এস এর দৌলতে মূক ও বধিরও সাবলীল । কাজেই এখন মিমির গল্প বলার পালা শুরু হল । সাঙ্গ হল মৃগেনের

কাহিনী । মজার ব্যাপার হল এগুলি সবই কারো না কারো জীবনের মূল অধ্যায় । বানানো গপ্পো নয় । একেবারেই !

অনেকের আজব লাগবে, অনেকে অবিশ্বাস করতে পারে কিন্তু এগুলো হল ছয় বন্ধুর নিজের কথা । যাকে গল্প নাও বলা যেতে পারে ।

মিমির মেয়ে ঝুমি, খুব কম বয়সেই একটি ছেলেকে দত্তক নেয় । তার নাম ছিলো তেজেন্দ্র , শর্টে তোজো । ঝুমি আসলে আঁকা শিখতে যেতো একটি স্কুলে । সেখানে ও তোজোকে দেখে । ছেলেটির কেউ নেই । বাবা ও মা মারা গেছে । ওর পরিবারের লোকেরা ওকে অনাথ আশ্রমে দিয়ে আসে । সেখানে অত্যন্ত অযত্নে ছিলো সে । ঐ আশ্রমের এক টিচারের, আঁকার স্কুলে সে আঁকা শিখতে আসতো আর ঝুমিও ওখানে যেতো । ছেলেটির নাম ছিলো তখন পল্লবিত , শর্টে পলু । একটু ছোটই ঝুমির থেকে । প্রায় ৬/৭ বছরের ব্যবধান । ছেলেটি মূক ছিলো । কথা বলতে পারেনা । সব কথা বলে ছবির মাধ্যমে । মানেই আঁকাই ওর জীবন ! ঝুমির বড় দু:খ হত । বাড়ি এসে সে মাকে বলে যে পলুর লাইফে কিছু

নেই । না কেউ ওকে চায়- না কেউ ওর কোনো ভালো করার কথা ভাবে ।

এইভাবে কী করে সে জীবন কাটাবে ? মা রাজি হলে, ঝুমি ওর বন্ধু পলুকে দত্তক নিতে চায় ।

ঝুমি ; উচ্চ মাধ্যমিক দেবার পরেই ওকে নিজের বাড়ি আনে । পলুর নাম হয় তোজো , তেজেন্দ্র নারায়ণ , ভাওয়ালের সন্ন্যাসী রাজা , রমেন্দ্র নারায়ণের মতন ।

তোজো লেখাপড়ায় ভালো ছিলো । ক্লাসে প্রথম পাঁচ জনের মধ্যেই থাকতো । ওর জন্য বিশেষ টিচারের ব্যবস্থা করে ঝুমি । তোজো কেবল লাইন আর ডট ব্যবহার করে আঁকতো । তাতেই এক একটি বড় ছবি হতো । পোর্ট্রেট হলে তার মধ্যে মানুষটির শখের জিনিসও মেশানো হতো , আঁঠা দিয়ে বা চূর্ণ হিসেবে । যেমন:::নকল মণিমুক্তো, গাছের ছাল, কিছু প্রজাপতির ডানা , সবুজ ঘাস ইত্যাদি । এগুলো ঐ মানুষটির জীবনের নানান অধ্যায়কে থ্রী ডায়মেনশানে ধরতো । আর আঁকলে, আগে ডট দিয়ে দিয়ে সেই ছবি হতো । অবশ্য কোনো মানুষের সেক্স বোঝা যেতোনা ওর ছবিগুলো দেখে !! এটা এক আজব ব্যাপার । কেন যেন লিঙ্গহীনতায় ভুগতো ওর প্রতিটি জীবন্ত ছবি ।

ওকে আর্টে দেবার প্ল্যান হল । শেষে আর্টেই দেয় ওরা ।

ইতিমধ্যে মিমি লক্ষ্য করলো যে তোজো কেমন বদলে যাচ্ছে । মূক ছেলেটির চোখ দুটো ছিলো অসম্ভব এক্সপ্রেসিভ্ । দুটি নয়নে যেন বিদ্যুতের চমক । কী যে বলতে চায় সে বোঝা যায়না কিন্তু অস্থির হয়ে উঠেছে তোজো কিছু বলার জন্য --সেটা বেশ মালুম হয় ওদের । মিমি ওর স্বামীকে বলে এই ব্যাপারে । ওরা ততদিনে সাইন ল্যাঙ্গুয়েজে কমিউনিকেট করতে পারে অল্প স্বল্প ।

সেইভাবেই বোঝা যায় যে তোজো যা বলতে চায়, তা কেবল ঝুমিকেই বলবে আর কাউকে নয় । থ্রিল, উত্তেজনা আর একটা ক্ষীণ দুশ্চিন্তায় ছিলো মিমি আর তার পতিদেব ।

না জানি কী বলে ! একে তো মেয়ের এই খেয়ালিপণায় বাবা বেশ বিব্রত কারণ ঝুমি বলেছে- যে ওকে বিয়ে করবে সে তোজোকেও নিজের ছেলে বলবে । নাহলে ঝুমি তাকে বিয়ে করবে না । হয়ত মেয়েটার আর বিয়েই হবেনা কখনও ! কে জানে ? তোজোকে বাড়িতে, পাকাপাকিভাবে আনার ব্যবস্থা না করলেই হতো । কিন্তু ঝুমি শাসিয়েছিলো যে তোজো না এলে সে সুইসাইড করবে !

ঝুমির আবার সবকিছু নিয়ে একটু বাড়াবাড়ি করার স্বভাব আছে । সে পুর্ণিমা রাতে, এক বনে গিয়ে তোজোর আর্জি জানবে- এই মত প্ল্যান করে ।

শুভ পূর্ণিমা দেখেশুনে- ওরা তিনজন যায়, তোজোকে নিয়ে এক অরণ্যে । মাচায় বসে বাঘের জন্যে অপেক্ষা না করলেও ,যথাসময়ে ঝুমি জানতে পারলো যে তোজো মেয়ে হতে ইচ্ছুক । সেক্স চেঞ্জ করতে চায় সে । মেয়েরা বেশি কথা বলে । কাজেই মেয়ে হলে হয়ত তার মূক হয়ে থাকা থেকে মুক্তি পাবে । অল্প কথা বলবে । ব্যালেন্স হয়ে যাবে । বোবা হয়ে থাকতে হবেনা আর ।

এই আজব যুক্তি শুনে হেসেই ফেলে মিমি ও ঝুমির বাবা । দুজনেই খুব হাসছে । এটা হল তোজোর খেয়ালিপণা ।

কিন্তু ঝুমি বেঁকে বসে । সে বলে- যেমন করেই হোক্ তাকে এই প্রস্তাব মেনে নিতে হবে । কারণ সে তোজোর দায়িত্ব নিয়েছে জেনেশুনেই যে সে মূক । কাজেই তার মুখে খৈ ফোটাবার দায়িত্বও ঝুমির ওপরেই এসে পড়ে । তাই চেষ্টায় কোনো ত্রুটি রাখতে চায়না ঝুমি !

গোলাপগড়ে গাঢ় আঁধার । সবার খাওয়া শেষ । সবাই মন্ত্রমুগ্ধের মতন একের পর এক গল্প- বা জীবন কাহিনী শুনে চলেছে । অনেক চোখে যদিও ঘুমের রেশ ! আর

মাত্র একটা গল্প বাকি । সবাই স্থির করে, সেটা পরেরদিন সকালে প্রাত:রাশ খেয়ে উঠে শুনবে ।

এই নিয়ে ওদের মধ্যে আলোচনা হয় । সবাই রাজি হয় । শুধু দু-একজন অতি উৎসাহী, পুরো গল্প শুনে যেতে ইচ্ছুক । এতে নাকি স্বস্তিতে রাতের ঘুমটা হবে ।

গ্রামের রাত্রি । শেঁয়ালের ডাক , অচেনা পশুর মিহি শিস্ আর বাতাসের শন্‌শনানির মধ্যেই ভেসে আসে রাজার ভরাট গলা ! ----মিমি, তোর গল্পের এন্ডিং-টা কী ? তুই ব্যাটা সত্যিই এক গল্প ফেঁদেছিস্ মনে হচ্ছে । এরকম বিদ্‌ঘুটে কান্ড আমি আগে কখনও শুনিনি । লোকে সেক্স বদলাচ্ছে আজকাল শুনতে পাই-- কিন্তু এরকম এক আশ্রিত মানুষ; যার নিজের কোনো ঠিকঠিকানা নেই, কোনো স্বর নেই গলায়- তার এমন অদ্ভুত সাধ জাগে কী করে ? আর ঝুমিই বা এগুলোকে নিয়ে মাতামাতি করছে কেন ? কেন আশ্‌কারা দিচ্ছে ওকে ? ওকে ম্যানার্স শেখানো উচিৎ আর ভদ্র ব্যবহার করা । যার খাচ্ছে, পরছে তারই দাড়ি উপড়াতে ওকে কে বলেছে ? যদি করাও হয় তাহলে এরকম উদ্ভট খেয়ালে কত খরচ হবে সে খেয়াল আছে ? আর কে দেবে এইসব খরচাপাতি ?

তেজেন্দ্রকে- তেজের সাথে নিজের ইন্দ্রিয়কে কন্ট্রোল করতে শেখানো উচিৎ; আজেবাজে ভাবে পয়সা উড়ানোর আইডিয়া, মাথা থেকে তাড়িয়ে দিয়ে ।

এত কথা একসাথে বলে ঈষৎ হাঁপিয়ে ওঠে রাজা ! আসলে- একবার উন্মাদ হবার চক্রে পড়াতে হয়ত ওভার কন্‌শাস্‌ হয়ে গেছে । কেউ আবার যুক্তির অভাবে কাউকে পাগল ভেবে বসছে না তো !

লাস্ট গল্প পরের দিনই হবে । এমনই স্থির হল । তবুও সবাই শুতে যাবার আগে এককাপ কফি খেতে ইচ্ছুক তা বেশ বোঝা গেলো । আড্ডাটা টেনে যেতে চায় আর কি !

ওদের এক চাকর, বৈজনাথ এসে গরম কফির পেয়ালা আর সাথে কিছু মুচমুচে বিস্কুট সাজিয়ে দিয়ে গেলো গোল টেবিলে । টেবিলটা শ্বেতপাথরের । পাশেই তোজো নয়; তাজা চাঁপা ফুলের ঝাড় । একটু নেতিয়ে আছে অবশ্য । সবাই কফি খেতে খেতে সেদিনের মতন আসর ভাঙলো । এবার পায়ে পায়ে যে যার ঘরের দিকে , এই কালপুরুষের মতন মহলের বুকে ।

প্রত্যেকের ঘরে তাজা রাত ফুল । রাতপাখির ডানা থেকে হিম ঝরছে যেন ! টিউহা, টিউহা ডাক !

শীতল ঘর । শুকনো পাতার মচমচানি এমনই মরমিয়া বাঁশীর মতন যেন এই গভীর রাতেই সে উড়ে যেতে চায় অমরাবতীতে ।

কুবেরের ধন শেষ হলেও গ্রামের রূপের ছটায় ,কোনো ভাঁটা পড়েনা ---এরকমই মনে হয় আজকাল রাকার । তাই প্রায়ই এই বাসায় এসে ওঠে । ক্লান্তি কেটে যায় । বেশি দাম দিয়ে ওকে এখানে অর্গ্যানিক সব্জি কিনতে হয়না । ওদের বাসায় যা চাষ হয় সবই প্রচন্ড ভাবে অর্গ্যানিক । এই নির্মম ভেজালের বাজারে ।

সূর্যমুখী ফুলে তেমন গন্ধ নেই কিন্তু সুন্দর । তাই নিজের ঘরে রাকা, নকল সূর্যমুখী লাগাতে বলেছে । অনেকগুলো ফুল নিয়ে, তার গলা টিপে ধরে ফুলদানিতে না রেখে ডাঁটিগুলো একটি টবে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে । আইডিয়া রাকার কিন্তু কাজটা করে গেছে বৈজনাথ ।

বিহারের লোক হলেও বৈজনাথের রুচি বেশ তারিফ করার মতন । টাট্‌কা ঘিয়ে চুবিয়ে রুটি খায় । বড় পাতার চা ভিজিয়ে খায় । ফুটিয়ে গজ করেনা ; গুঁড়ো চা । আর মাংস কাটা দেখে মনে কষ্ট হওয়ায় নিরামিষ খায় । মূর্গী কেটে ফেলে, মাথাটা সরিয়ে রাখলে অনেক সময় নাকি দেহটা উড়ে যায় ! বেচারা হয়ত ভাবে উড়ে গেলেই বেঁচে উঠবে কারণ সে এক পঙ্খি ! বৈজনাথের কাছে শুনেছে রাকা । খারাপ লেগেছে । কিন্তু লোকটি নিজেকে বদলে নিয়ে এখন কেবল নিরামিষ খায় । এটাই বেশি ইম্পর্ট্যান্ট । নিজেকে বদলে ফেলা সহজ নয় । ইয়া ইয়া লোকই পারেনা আর এতো একটা বিহারী গেঁয়োভূত ! খালি ছাতু আর লিট্টি খায় , মেটে সিঁদুর , অসম্ভব ব্রাইট রং সবেতে যাকে রুচিপূর্ণ লোক বলে থাকে ফ্লুরোসেন্ট কালার আর নিজ দেহাতি ভাষায় কমিউনিকেশান !

ওর নাকি অনেক বাচ্চা । বৌ তাদের নিয়ে গ্রামে আছে । অনেক বছর সে বাড়ি যায়নি আর গ্রামের সংবাদ পায় অন্য দেশী ভাইদের কাছে যারা এখানে নানা কাঠগোলা ও লরির ধাবা চালায় ।

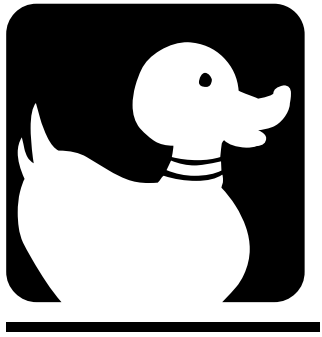

মিমির নাতি অর্থাৎ ঝুমির পালিত পুত্র তোজো শেষ পর্যন্ত নাকি সেক্স বদলে নিয়েছে । মেয়ে হয়েছে সে । মিমি ও ঝুমি তাকে শেখাচ্ছে নানান আদব কায়দা যা মেয়েরা সাধারণতঃ করে থাকে । তবে এই বৈজ্ঞানিক কায়দায় কিন্তু মুখে ভাষা ফেরেনি ! খৈ ফোটা তো অনেক দূরে ! তবুও আজ জলে ভেসে বেড়ানো হাঁসের মতন সাবলীল তোজো এক পূর্ণ নারী হিসেবে স্বীকৃতি পেতে চলেছে । ও মেয়েদের মতন চুড়ি পরছে বিশেষ করে কাঁচের চুড়ি । রং বেরং এর চুড়ি । মেয়েদের জীবনে যে অনেক রং ও সৌন্দর্য্যের মেলা । ছেলেরা অত সাজে কৈ আর ? তোজো এখন মাস্কারা , কাজল লাগাচ্ছে । লম্বা বেণী ! কখনও এলোকেশী । কখনও বা কাঞ্জিভরম্ নয়ত তাঁতের রংচং-এ পোশাকে মোহময়ী !

লাজনম্রা , ঈষৎ ভারী- কোমড়ের গঠণ , নয়নের আভায় সূর্মা আর মুখে হাল্কা এক দ্যুতি তোজোকে মায়াবিনী করে তোলে । তাই নামও বদলে যায় । ও এখন তোতা । তোজো থেকে তোতা । ঝুমির মেয়ে তোতা । মিমির নাত্নি আর তোজোর সন্তানের মা , তোতা ।

শুধু মুখে তার তোতাবুলি নেই, যার জন্য এই পরিবর্তন ! আসলে তোজোর জীবনটাই মেটাফোর । মিথকথন । হয়ত তাই আজও সে নীরব ! শুধু দুটি কথায় ভরা আঁখিপল্লব হারিয়ে যাওয়া পলুকে , পল্লবিতকে দারুণ পল্লবিত করে । পলু থেকে তোজো থেকে তোতা !

এরই নাম--বিজলী হেনে বিচ্ছুরণ !

অনেকে অবশ্যই শিখন্ডী অথবা বৃহনল্লা বলে ব্যঙ্গ করে । তাতে কিছু যায় আসেনা । এক জীবনে যারা এতখানিই বদলায় , বদলাবার স্বপ্ন দেখতে পারে আর বদলায়ও তাদের কারো কথায় কিছু হয়না । তারা ভেসে বেড়ায় হাঁসের মতন- জীবননদে অথবা হংস মিথুনের মতন নীল গগনে উড়ে যায় ; সমস্ত সীমানা ও শামিয়ানা ছাড়িয়ে !

সুর্যের সোনারং মেখে, পরদিন প্রত্যুষে সবাই জড়ো হয়েছে হলঘরে । আজ মেখলা পরেছে মিমি । দারুণ লাগছে তাকে । গ্রামের মেয়েদের মতন ব্লাউজ ছাড়া শাড়ি পরেছে রাকা । সুতির শাড়ি । বাসন্তী আর গাঢ় সবুজের

নক্শা কাটা । খালি গা , চুলে কলাবতী ফুল । দুই পায়ে নূপুর । অন্যরকম লাগছে । বলে উঠলো রাকা :: --আহা আজ যেন বাঙালী মেয়ে হলাম । এইসব জোব্বা আর টাইট প্যান্ট ফ্যান্ট পরে সবসময় দম ফেটে বেরোয় । এখন আমি মুক্তাঙ্গনে, এক মুক্ত নারী- যে বাঙালী আর তার আজকে মহা আনন্দ হচ্ছে , পুরনো যুগে ফিরে এসে ।

এখন গল্প বলার পালা বয়ের । বয় একজন লেখক । মানে গল্প লেখেনা । টেকনিক্যাল্ রাইটিং করে । নানান টেকনোলজির ব্যাপারে, কোম্পানির হয়ে লেখে । পুরোদস্তুর সাহেব । অনেকদিন বিদেশেও ছিলো ।

আগে বিজ্ঞান পড়েছে । মাঝপথে ছেড়ে দিয়ে লেখালেখি জগতে চলে যায় । কিন্তু কল্পনাশক্তি কম থাকায় সে টেকনিক্যাল রাইটিং করে । কল্পনাশক্তি যে নেই তা নয় কিন্তু অতি লো-গ্রেডের আজেবাজে লেখা লিখে লোকের

ব্যঙ্গের শিকার হতে চায়না । কাজেই সে এখন লজিকে লেখে । লেখার হাত ছোট থেকেই ভালো ।নোটস্ মুখস্থ করে কোনোদিন পাশ করেনি । নিজে পড়ে নিয়ে যা বুঝেছে তাই লিখেছে । ক্লাসে যা পড়াতো সব বুঝে যেতো বয় আর মনেও থাকতো । ওর মেমারি খুব ভালো । তারপর নিজের ভাষায় ব্যক্ত করতো, সেই বোঝা অংশ খানি। কাজেই লেখাকে পেশা হিসেবে নিয়েছে বলে অবাক হবার কিছু নেই ।

বয়ের গল্প হল তার প্রথম জীবনের এক মেয়ে , শাবানাকে নিয়ে । শাবানাকে অবশ্য এরা সবাই চেনে । কারণ ওরা সবাই শৈশবের বন্ধু আর শাবানা এমন এক মেয়ে যে নিজের মনের মতন বস্তু পাবার জন্য এক্সট্রিমে চলে যেতে দ্বিধা করেনা ।

বয়কে নিয়েই স্বপ্ন দেখতো তার পড়শী শাবানা । কিন্তু ইসলাম ধর্মের মেয়ে বলে বয় ওকে পাত্তা দিতো না । বয়ের ধারণা ছিলো যে এরা অসম্ভব নোংরা আর অ্যাগ্রেসিভ্ হয় । আর শাবানাকে ওর বৌ করার মতন ভালো মোটেই লাগতো না । আসলে শাবানার ন্যাকামি আর হ্যা হ্যা করে হাসি ও চোখ মারা এসব দেখে বয়ের

ওকে এক উচ্ছল নয় উচ্ছৃংখল মেয়ে বলেই মনে হত । যার না কোনো মরাল আছে না লজ্জা ।

নিজেকে মেয়ে না বলে- ওর **বাজারের মেয়েমানুষ** আখ্যা পাওয়া উচিৎ । ওকে এতই ঘৃণা করতো বয় যে ওর ছায়া মাড়ালে দশবার স্নান করতো । আর শাবানাও সেরকম জেদি মেয়ে । বয় যতই নিজের অনিচ্ছা জানায় ততই যেন শাবানার জেদ চেপে যায় । বয়কে তার নিজের করেই ছাড়বে ! বয় তো বয় তাকে গার্ল শাবানা চাইতেই পারে তাতে এত বিবাদের কী আছে ?

একদিন অবস্থা এমন চরমে ওঠে যে রাগী শাবানা, বয়কে তার প্রস্রাব মিশ্রিত জল পান করতে দেয় । আসলে পড়শী হিসেবে ওরা একে ওপরের বাড়ি যাতায়াত করতো । বয় তো গন্ধ পেয়েই বুঝেছে ! জল খেতে চায়না সে । তখন শাবানা এসে অত্যন্ত রুক্ষ গলায় বলে ওঠে ::: এবার আমি তোমাকে রেপ্ করে দেবো !

এবং রেপ্ করেও ! জোর করে বয়ের সাথে যৌন সম্পর্ক

তৈরি করেও ক্ষান্ত হয়না শাবানা । ওকে শর্টে লোকে শাবা বলতো । আর বয় বলতো সাবান । ওর চারিত্রিক পিচ্ছিলতা দেখে । শাবানা ; বয়কে রেপ করার সময় কিশোরী বলে হয়ত বেশি কিছু জানতো না তাই বলে ওঠে :: একি তোমার এই অবস্থা কেন ? কেন আমার

আরাম লাগছে না ? তোমার হিশু করার অঙ্গটা এরকম লতার মতন নেতিয়ে পড়েছে কেন ? আমি শুনেছি যে এরকম সময় কিছু একটা ঘটে তাই ছেলেরা তখন প্যান্ট

পরতে পারেনা !! তাই অনেকে লুঙ্গি পরে থাকে ।

শাবানা এক আজব মেয়ে । সাহসী , খোলামেলা আর একরোখা ! ভীতু ও লজ্জিত , উলঙ্গ বয় উত্তরে বলে ওঠে :: আমি এসব কিছু জানিনা ! এবার শাস্তি হয়েছে তো আমার ইজ্জৎ নিয়ে ? এবার দয়া করে আমাকে মুক্তি দাও ।

শাবানা দমবার পাত্রী নয় মোটেই । তাই ত্রিগুণ উৎসাহে বলে ওঠে :: ইজ্জৎ আর নিলাম কৈ ? পারলাম কি?

তোমার ঐ জায়গাটা এরকম নরম আর ভ্যাদভ্যাদে কেন ? তুমি ডাক্তার দেখাও !

--নাহলে কী? হ্যাঁ ? নাহলে কী হবে ? রেগে বলে ওঠে বয় ! সাবান ; কুচক্রীর মতন তাকিয়ে বলে ওঠে :: নাহলে আর বয় থাকবে না , একেবারে জন্মের মতন গার্ল হয়ে যাবে তুমি ; আমার বলদা পাঁঠা !!!

টেকনিক্যাল লেখালেখি করতে করতে, জানতে পারে বয় যে দুনিয়ায় অনেক রেয়ার ক্যান্সার আছে। তার চিকিৎসা করার জন্য যথেষ্ট ওষুধ আর ব্যবস্থা নেই ডাক্তারদের কাছে। ক্যান্সার বলতে সাধারণতঃ লোকে ফুসফুস, কোলন, জরায়ু, গলা, ব্রেস্ট, রক্তের ক্যান্সার ইত্যাদিই বোঝে। কিন্তু আরো হাজার হাজার ক্যান্সার আছে যার ওপরে গবেষণা হয়না বলে, ডাক্তাররা তার চিকিৎসা করতে অক্ষম; এমনকি নামই শোনেনি অনেকে। এইসব ক্যান্সারের ক্ষেত্রে, এদের জনপ্রিয়তা কম হওয়ায় রিসার্চে কেউ অর্থ ঢালে না। কিছু সংস্থা আছে যারা রেয়ার ক্যান্সার নিয়ে কাজ করে কিন্তু তাদের সংখ্যা খুবই কম আর তাই ধর্তব্যের মধ্যেই পড়েনা - **কাজেই এইসব রেয়ার ক্যান্সার নিয়ে লিখে, তার সম্পর্কে লোককে সচেতন করার ব্রত নিলো বয়।**

এইভাবেই এক সন্ধ্যায়- আঁধারের মতন ঘিরে ফেললো বয়ের ঘর; সেই রেয়ার ক্যান্সার। নাহ্! তার সচেতনতার অংশ হয়ে নয়- বয়ের দেহের অংশ হয়ে।

পেটে তার কর্কট রোগ !!! বাইল ডাক্ট্ ক্যান্সার যা শোনা যায় এই নামে ---cholangiocarcinoma .

একজন ক্যান্সার অ্যাডভোকেট থেকে সোজা রুগীর বিছানায় **! বেশিরভাগ লোকের রেয়ার ক্যান্সারের চিকিৎসা দেরীতে শুরু হয় ।** উপযুক্ত চিকিৎসা লোকে পায়ও না সবসময় । হয়ত চিকিৎসাই নেই কোনো । তাই এই ধরণের লোকেরা আজকাল নিজেদের সংস্থা গড়ে তোলে আর মানুষকে বলে এইসব চিকিৎসার জন্য খোলা হাতে দান করতে ; হয়ত আজ যারা দাতা কাল তাদেরই কারো এই ওষুধের দরকার হবে ।

আন্তর্জালের যুগে , সুবিধে অনেক । রেয়ার হলেও নানান দেশ মিলে অনেক মানুষের একটা গোষ্ঠী তৈরি হয় । লোকে নিজেকে আর একা মনে করেনা । আলোচনা , সাহস পাওয়া , আশার আলো দেখতে পাওয়া যে নাহ্! অমুকে আজও ভালো আছে এই রোগে আক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও । নিজেদের চিকিৎসা বিধি নিয়ে সবাই সরব হয় ।

কী খাবে , কী করবে জানতে পারে । মনটা হাল্কা হয়, অন্যান্য মানুষদের একই অবস্থায় দেখে ।

বয় কিন্তু cholangiocarcinoma -র একজনও রুগী খুঁজে পেলোনা তার শহরে । সে তখন বিদেশে ছিলো । তবুও কেউ নেই ওর নৌকোতে । হাল ধরার জন্য । এই রোগ এতই কম হয় যে কাউকে পাওয়া মুস্কিল !

অন্যান্য ক্যান্সারে আক্রান্ত লোকেরা এগিয়ে যাচ্ছে তরতর করে চিকিৎসা জগতে- আর বয় একাকী বসে আছে আশার বাতি নিভিয়ে দিয়ে !

ঠিক এইসময়ই সন্ধান পায় সোনিয়া পামার-এর । অন্য দেশে আছে । ঠিক এই একই ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়েছে । বেঁচে আছে আজ এক বছর হল ! তার ক্যান্সার বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে , পুরোপুরি ---আর রেকার করেনি । এখনও রেমিশানে আছে । ক্যান্সার জগতে নিজেদের টার্ম আছে । কিমো কাটে পরার নানান রঙীন পরচুলো আছে । আছে কে কতদিন জীবিত আছে তার ওপরে প্রাইজ নিজেদের সংস্থা থেকে দেওয়া আবার যাদের জীভ, এই অসুখের জন্য কাটা পড়েছে বলে অন্য সুস্থ লোকেরা তাদের বিদ্রুপ করে সেইসব মানুষের জন্য চ্যাটরুম, আশ্বাস দেবার মতন বাণী আর উৎসাহ দেওয়া সমস্ত গল্প এসবই বয় জেনেছে তার ক্যান্সার ধরা পড়ার পরে । আগে মনে করতো এরা আছে , আবার নেই । ব্যস্ ।

কিন্তু এদের যে একটা বিশাল জগৎ আছে তার হদিস্ পেয়েছে সদ্য । যারা লং টার্ম সার্ভাইভার ; তাদেরকে এরা অনেক ক্ষেত্রে বিশেষ সম্মানে ভূষিত করে যে তারা অসম্ভব লড়াকু । এত শক্ত শক্ত ওষুধ নিয়েও লড়ে যাচ্ছে , ক্রমাগত । ক্যান্সার হল এমন এক অসুখ যা সবার জন্যই এক অভিশাপ হয়ে দেখা দেয় । দৈহিক বেদনার সাথে সাথে মানসিক ব্যাথাও তীব্র । মানুষ কী করবে , কোথায় যাবে তা ভেবে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে । আর সেখানে যদি এমন ক্যান্সার হয় যা খুবই বিরল জাতের তাহলে তো কথাই নেই । সোনায় সোহাগা ।

বয়ের ভাগ্য ভালো যে সে এমন একজনের সন্ধান পেয়েছে যে অন্য দেশে হলেও আজও জীবিত আছে , একবছর পরেও ; cholangiocarcinoma একটুও থাবা বসাতে পারেনি এই মহিলার ভুবনে । মহিলা চার্চে গান করতো । স্বামী তার পুলিশে কাজ করতো । সন্তান সন্ততি নেই ওদের- এখন কেবল দেখা হবার অপেক্ষায়, একই যাত্রায় পৃথক ফল হবেনা ভেবে মনটা এত কষ্টের মধ্যেও কিঞ্চিৎ উৎফুল্ল ----।

সোনিয়া পামার, কোনো অজ্ঞাত কারণে আগে যোগাযোগ করতে রাজি ছিলোনা । ওকে মেসেজ করার পরে নানান টালবাহানা করছিলো । তারপর ওকে

ক্যান্সার সংস্থা থেকে অনুরোধ করার পরেও গাফিলতি করতে থাকে । লোকে ভাবে যে এরকম দূর্ভাগ্যের শিকার হয়েছে বলে হয়ত লোকের মাঝে আসতে চায়না ।

কিন্তু যারা ওর মতন অভাগা- তাদেরকে আলো দেখানো তো এক মহৎ কাজ । সেটা করতে ওর এত অনীহা কেন ?

অনিচ্ছার কারণ জানা যায় পরে ।আমরা পুরোটা না জেনেই নিজের মতন একটা ছবি তৈরি করে নিই ।

পরে দেখা যায় যে কারণটা সত্যিই একটি জটিল জিনিস- কারো কারো কাছে ।

বয় জানলো যে তার পুরনো বান্ধবী ও রেপিস্ট শাবানাই আসলে সোনিয়া পামার ।

এই আজব ক্যান্সারের শিকার হয়েছে সে- কিন্তু সংস্থার দ্বারা বহু রুগীর সাথে যুক্ত হলেও বয়ের ফটো দেখে ওয়েবসাইটে ;ওকে প্রতাখ্যান করে ইচ্ছে করেই । আসলে সোনিয়া নিজের ছবি দেয়নি । আর বয়ের সাথে দেখা হওয়া মানে পুরনো কাসুন্দি ঘাঁটা আর ইমোশান্স নিয়ে কাটাকুটি খেলা । তাই সরে গেছে । মনে করেছে যে আরো কিছু রুগী তো আছে কাজেই বয়ের অসুবিধে হবেনা । কিন্তু বয় একজন ভারতীয়কে

পেয়ে তার সাথেই যোগাযোগ করতে সবচেয়ে বেশি আগ্রহী হয় । আমাদের কালচার , ইচ্ছে অনিচ্ছে , নিয়ম কানুন এগুলি সে জানবে ভালো তাই ।

খানিকটা বয়ের চাপেই সোনিয়া, আত্মপ্রকাশ করতে বাধ্য হয় । বয় কিন্তু পুরনো গল্প নিয়ে মাতেনা ।

যদিও সোনিয়াকে অসম্ভব ঘৃণা করতো কিন্তু আজ-- জীবনের এক জটিল অধ্যায়ে পৌঁছে মনে হচ্ছে, তারা যখন একই তরীতে বসে আছে তখন ভাগ্যেরও হয়ত ইচ্ছে ছিলো যে ওদের মিলন হোক্ ।

সোনিয়া বিবাহসুত্রে পামার । ওর স্বামীর নামও আশ্চর্য জনক ভাবে বয়ের সাথে মিলে গেছে । বয়েড্ পামার ।

সোনিয়া বললো যে সে পামারের সাথে বিয়ে করেই বিদেশে আসে । পামার তখন ভারতে ঘুরতে নয় কাজেই গিয়েছিলো । ওদের আলাপ হয় এক ঐতিহাসিক শহরে । বয়েড্ পামারের বিষয় ছিলো প্রাচীন ভারতের রাজামহারাজার ইতিহাস । একটি ডকুমেন্টারি বানাতে যায় । অনেক দিন ছিলো সেখানে প্রধানতঃ রাজাদের শহরে । ইন্দোর, গোয়ালিওর, জয়পুর, পুণা এবং আরো মনার্ক জড়িত শহরে ।

সোনিয়ার সাথে আলাপ হয় । পরে দুজনে বিয়েও করে । বিদেশে এসে সোনিয়া প্রথমে পিৎজা ডেলিভারির

কাজ করতো । নিজেই গাড়ি চালিয়ে গিয়ে পিৎজা দিয়ে আসতো । মাইনে খুব বেশি নাহলেও ওর একার চলে যেতো । ওর স্বামী বয়েড্ ; বেশিরভাগ সময়ই বিদেশে কাজে যেতো । সোনিয়ার চাকরিক্ষেত্র অর্থাৎ সেই পিৎজা অফিস , শেষের দিকে আর মাইনে দিতো না । অনেক অনেক মাসের মাইনে বাকি পড়ে ছিলো ।

কর্মীরা সবাই নানান পতাকা , স্লোগান নিয়ে জড়ো হয় অফিসের সামনে । কিন্তু বিদেশীরা টাকা পেলেও ভারতীয় আর চীনারা পয়সা পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয় ।

এরপরে, জীবন মসৃণ নয় । চাকরি পেতে অসুবিধে হয় । স্বামীর মন খালি পরস্ত্রীর দিকে । পার্টি করা আর অ্যালকোহলে ডুবে থাকা এই দুটি জিনিসেই সে মত্ত থাকতো ; দেশে থাকলে । এইভাবে আর কতদিন চলে ? কাজেই বিচ্ছেদ হয়ে যায় সোনিয়ার সাথে । কিন্তু ডাইভোর্স হয়না । কারণ সোনিয়া ওকে ছাড়বে না ! এই বিদেশ বিভুঁইয়ে একাকী সোনিয়া কেন থাকবে ? ওকে তো এনেছে এই বয়েড্-ই ! বিয়ে করে । স্ত্রীর মর্যাদা দিয়ে । তাই সেপারেশন নিয়েই থাকে । কোথায় থাকে সোনিয়া পামার ?

এক পরিত্যক্ত শহরের ; অট্টালিকায় !

এখানেও আসা, ঐ ইতিহাস ও সুন্দরী নারী পাগলা স্বামীর সাথে । এই শহর কেন লোকেরা ছেড়ে গেলো তা এখনও রহস্য । এই অত্যাধুনিক শহরে হাই রাইজ, আধুনিক রাস্তা , বাজার , শপিং মল, অ্যাপার্টমেন্ট , বড় বড় কার পার্কিং , আন্ডার গ্রাউন্ড হোটেল , লাইব্রেরি, অফিস , কাছারি সমস্ত ছিলো । কিন্তু কোনো এক রহস্যজনক কারণে, একদিন সমস্ত বাসিন্দা আর চাকুরেরা এই শহর চিরটাকালের মতন ত্যাগ করে চলে যায় । অনেকে বলে- বিষাক্ত গ্যাসের প্রকোপে পড়েছিলো এই নগর, তাই সবাই পালায় আর ভয়ে ফেরেনি , কেউ বলে ভৌতিক ব্যাপার ঘটে তাই ক্রমশ খালি হয়ে যায় আবার কেউ বলে মাফিয়া রাজত্বের কবলে পড়ে, মহানগর শুন্য হয়ে যায় ।

যাদের নিতান্তই উপায় নেই, তারাই ছিলো কিন্তু পরে বাজার ও হাসপাতালের অভাবে তারাও পালায় । এখানেই এক বিরাট ফ্ল্যাটে ছিলো সোনিয়া আর বয়েড্ । বয়েড্ তো বিদেশেই থাকে আর এখন সেপারেশানের পরে অন্য বাসায় ; কাজেই সোনিয়া এখানে একাই আছে । আরো অল্প সংখ্যক মানুষ ওর আশেপাশেই থাকে । ওরা নিজেদের বাসায় থাকে । একটু দূরেই

অন্য শহর । আনাজ , সব্জি আনতে আর চিকিৎসকের খোঁজে সেখানেই নিয়মিত যাতায়াত করে থাকে ।

অন্য সময় এই নিরিবিলি, পরিত্যক্ত ও রহস্যময় এলাকায় দিন যাপন করে ।

বয় এমন এক নগরের সন্ধান পেলো যেখানে কেউ থাকে না । গুটিকয়েক মানুষ আছে । কেউ স্মৃতি আঁকড়ে আর কেউবা এমনিই । কিছু মসীজীবি নাকি এখানে আছে ! তারা এই একাকীত্ব , নিরিবিলি ব্যাপারটা উপভোগ করে । তবে কিছু দরিদ্র মানুষও এসেছে । বড় বড় ফ্ল্যাট জুড়ে তারা আছে । ঝকঝকে ঘরে ফুটো , জীর্ণ পর্দা । তবুও ওখানে মানুষ আছে কিছু !

ফেলে যাওয়া সবকিছু আঁকড়ে ধরে, সময়ের বুকে গা এলিয়ে বাস করছে গরীব গুর্বোরা ।

ওরাও হয়ত দূরের শহরে যায় । ওদের মোটর গাড়ি নেই- কিন্তু পা-গাড়ি ও সাইকেল থাকে । আজকাল পা-গাড়ি ব্যবহার করলে হার্ট ভালো থাকে । তাই অনেকে আবার স্বাস্থ্য ফেরাতে এখানে আসে । আস্তে আস্তে আবার লোক হচ্ছে-- তবে সিংহভাগ অঞ্চল জনমানবহীন ।

সোনিয়াকে দেখে, অনেকদিন পরে তত খারাপ লাগেনি বয়ের । সোনিয়াকে সে কোনোদিন কামনা করেনি কিন্তু দেখতে পাচ্ছে যে সোনিয়া তার জীবনের এক অনবদ্য অঙ্গ হয়ে উঠেছে । এমন কি ওর স্বামীর নামও একরকম । খুবই আজব ব্যাপার । যাকে মুছে ফেলতে চেয়েছে, সে আবার এসেছে জীবনে আর এমন মূহুর্তে যে তাকে অস্বীকার করার সাহস নেই আর সেই মেয়েটির স্বামীর নামও বয়ের নামের মতনই । **একসাথে অনেকগুলি কাকতলীয় রিনিঝিনি !!!**

সোনিয়াকে আজ তার অল্প অল্প ভালোলাগছে , আসলে সে তো আর আগের মতন নেই । অনেক বদলে গেছে ।

এই এলাকায় বছরে দুবার টাইম বদলায় । গরমের সময় যখন বেশিক্ষণ আলো থাকে, তখন সময় বদলানো হয় আবার শীতকালে যখন সন্ধ্যে নামে অনেক আগে- তখন ঘড়ি বদলে নেওয়া হয় ; মানে সময় ।

যেন অন্ধকার আর আলোর সাথে সময়, তাল মিলিয়ে চলে । বছরে, এই দুইবার -দুটি সময় পাল্টানোর জন্য ওরা ভারতের সময়ের চেয়ে অনেক আগে বা কম আগে থাকে ।

সোনিয়া বললো যে বয়েড্ নাকি ওকে জ্যান্ত কবর দেবার প্ল্যান করেছিলো একদিন ; আনারকলির মতন । তবে সেদিন ও নেশায় ডুবে থাকায় ওকে মানুষ ক্ষমা করে দেয় । আসলে পার্টিতে গিয়ে যখন আজেবাজে কাজ শুরু করে তখন সোনিয়া ওকে আটকাতে যায় । বয়েড্ ওকে কোলে তুলে নিয়ে বলে ওঠে :: তোমাকে জ্যান্ত কবর দেবো , বিচ্ ! তোমার দেশে তো প্রাচীন যুগ থেকেই এসব চলে আসছে ।

সবাই চমকে উঠলে কয়েকজন এগিয়ে এসে ওকে ছাড়িয়ে নেয় ।

শুনে বয় বলে ওঠে ::আজ তুমি এত পসেসিভ্ কিন্তু একদিন তুমিও তো এরকম ক্রেজি ছিলে মনে পড়ে ?

সোনিয়া হাসে । দু:খের হাসি । তারপর বলে :: আমি আজ বুঝতে পেরেছি যে বয় কিংবা বয়েড্ আমার জন্য লাকি নয় । আমার লাকি মানুষ হয়ত অন্য কেউ ছিলো , আমার সোলমেট্ -- যার সন্ধান আমি আর এই জীবনে পেলাম না ।

সোনিয়ার চোখে জল । এরকম আগে কখনো দেখেনি বয় !

ওর সাথে আজ কেবল রেয়ার ক্যান্সার নয় আলোচনা করতে ইচ্ছে করছে অতীতের প্রতিটি মূহুর্ত ! জীবন মায়াময় ; আর তা যদি ফুরাতে চলেছে এমন হয় তখন সব কেমন বদলে যায় । পুরনো সম্পর্ক, আশা, স্বপ্ন আর মানুষের সাথে যোগাযোগ ! এমন যে হবে কোনোদিন ভেবেছিলো বয় ? ও তো সারাটা সময় শুধু মুক্তি চাইতো , শাবানার হাত থেকে যে ওকে রেপ্ করে ওর পৌরুষকে অপমান করেছিলো কিন্তু আজ সেই শাবানা ওকে যেই রক্তের হদিস্ দিতে পারে বিশেষ করে তাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য তা আর কী কেউ পারবে ?

এরকম আশ্চর্য ক্ষণে আমাদের দাঁড় করিয়ে দেয় সময় যে কিছু ভাবার বা প্ল্যান করার অবকাশ থাকে না ! নিজেকে বাঁচাতেই, আজ বয়ের জীবনে শাবানা অর্থাৎ সোনিয়ার বড় প্রয়োজন । রেয়ার ক্যান্সারের দাপটে কেমন দুজনেই কাবু কিন্তু অতীতের ক্যানভাসে যেই চিত্র আঁকা আছে -তাতে দুজনেরই সু-সম্পর্কের কথা তো নেই বরং অনেক অনেক গরলের ছবি রয়েছে তবুও ঠিক সেই মানুষটির কাছেই পাততে হবে -আজ নিজ হাত, তাও নিজেকে বাঁচানোর জন্য যাকে সবসময়

অবহেলা করেছে আর যার মৃত্যু পর্যন্ত একদিন চেয়েছে , বয় !

শত্রুর সঙ্গে বিবাদ মিটিয়ে নিলেই বোধহয় তাড়াতাড়ি বিবর্তন হয় । নাহলে ইউনিভার্স এমন দাবার চাল দেয় যে সিচুয়েশান বদলে যায় আর শত্রুকে বুকে জড়িয়ে ধরে, পরম মিত্রের স্থানে বসাতে হয় । তবেই এগিয়ে চলা । কে কোন ধাপে আছে , বিবর্তনের-- কেউ জানেনা । তবে সমস্ত ঘৃণা আর পরাজয়কে যদি জয় করা যায় তাহলে বোধহয় পরের ধাপে কেন- ডবল প্রমোশান হয়ে দু-তিন ধাপ এগিয়েও যেতে পারে প্রাণীরা । আর পরাজয়ের গ্লানি ভুলতে না পারলে বারবার যুদ্ধ হয় । সোনিয়া ওকে রেপ্ করার সময় ওর পোশাক খুলে নিলো আর তখনই ও চীৎকার করে ওঠে :: আরে আরে আমার প্রাইভেট পার্টস্ দেখা যাবে যে ! সোনিয়া মুখ ভেঁচ্কে বলে উঠেছিলো :: তোমার এগুলো আর প্রাইভেট নেই হে , পাবলিক হয়ে গেছে । এবার থেকে আমিও উপভোগ করবো ।

কিন্তু বাস্তব জগতে দেখা গেলো যে সোনিয়ার প্রাইভেট পার্টস্ (একটু ভিন্নমতে , পেটের ভেতরে সেঁধিয়ে আছে যে অঙ্গ) পাবলিক হয়ে গেলো । আজ তার এই রেয়ার ক্যান্সার ; তাকে জনসমক্ষে নিয়ে এলো

উপকারের জন্য আর পেটের মধ্যে যা আছে তা খুল্লম খুল্লা হয়ে গেলো !

সোনিয়া জানালো যে অনেক রুগীর কাছে শুনেছে যে এই ক্যান্সারে তারা যা খায় বমি হয়ে যায় । সে এমনও লোকের সাথে পরিচিত হয়েছে যারা জল পর্যন্ত খেতে পারেনা । সমস্ত বমি হয়ে , পেট ফেঁপে অদ্ভুত কান্ড হয় । এক রুগীর ক্যান্সার হয়েছে বলে তাও রেয়ার , তাকে নাকি তার বর গুলি করে মেরে ফেলেছে । কারণ এই রোগের সেরকম উপযুক্ত চিকিৎসা নেই কাজেই বাঁচিয়ে রেখে শুধু শুধু রুগীকে কষ্ট দেওয়া ।

যেই দেশে এই নির্মম ঘটনা ঘটেছে সেখানে সবাই বন্দুক রাখতে পারে । আত্মরক্ষার জন্য । আর সেই সুযোগ বেয়েই নেমে আসে গাঢ় নিশা । অনেকে এই নিয়মকে চূর্ণ করে, মানুষ খুন করে । অনেকে বলে আত্মরক্ষা করলাম আবার অনেকে স্বীকার করে যে অন্যায় করেছে কিন্তু তার হাতে নতুন বন্দুক দিলে সে এই ঘটনা আরেকবার কেন বারবার ঘটাবে । অযথা বন্দুকের লাইসেন্স দেওয়া নিয়ে অনেক জল ঘোলা হলেও আজ অবধি কেউ কারো নিজস্ব বন্দুক রাখা থেকে তাকে বিরত করতে পারেনি ।

অন্য এক ক্যান্সার পেশেন্টকে তার ছেলে রাগের চোটে বিষধর সাপের মুখে ঠেলে দেয় । ওদের বাড়ি ছিলো একটি জলাশয়ের ধারে । সেখানে একটি তুঁতে রং এর বিশাল সাপ- যার গায়ে কমলা আর কালো দিয়ে চমৎকার নক্‌শা কাটা, সেই সাপকে দেখাবার ছল করে- ঐ রুগীকে তার সামনে ফেলে দেয় । কারণ হল এই যে- পেরেন্ট যখন এই রোগে আক্রান্ত তখন সন্তানের হতেও পারে । আর তাতে করে তার লাইফ, ফিনিশ্‌ হবার চান্স । কিন্তু জিনের গতি বদলানো তো মুস্কিল্‌ । তাই রাগের চোটে সাপের ওপরে দায়িত্ব দেয় পেশেন্টকে শেষ করে ফেলার । তুমি আমায় কর্কট দিলে আমি তোমায় ফণা !!!

আরেকজন মানুষের সাথে আলাপ হয় ; সে আর এখন জীবিত নেই । ঘুমের মধ্যেই মারা গেছে । শান্তিতে চলে গেছে । সে ভদ্রলোক নাকি একটি যন্ত্র তৈরি করেছিলো যা গলায় মানে ভোকাল কর্ডের কাছে বসালে সেটা ভাইব্রেট করে । আর যারা গান করতে চায় অথচ পারেনা তারা ঐ যন্ত্রের মাধ্যমে গান কেন শ্রাস্ত্রীয় সঙ্গীত পর্যন্ত গাইতে পারে । গলায় বসানো একটি চিপ্‌ যা ক্রমাগত কম্পনের মাধ্যমে গলার স্বরকে সাপোর্ট করছে । এবার গলা কাঁপিয়ে সৃষ্টি হচ্ছে অভিনব

কায়দায় সুরেলা মিউজিকের । কিন্তু যন্ত্রটি হয়ত আর বাজারের আলো দেখবে না । কারণ সেই ভদ্রলোক মারা যাবার পরে কেউ আর ওটা নিয়ে উৎসাহ দেখায়নি ।

---সত্যি আজব মেশিন কিন্তু , বলে ওঠে বয় ।

আসলে ঐ মানুষ, রেয়ার ক্যান্সারের রুগী--এই মেশিনের পরিকল্পনা করে, যাদের ভোকাল কর্ড নষ্ট হয়ে যায় তাদের কথা ভেবে । পরে ওটাকে গানের জন্য ব্যবহার করা হতে থাকে । কিন্তু এই অপরূপ মেশিন হয়ত আর কোনোদিনই আমাদের নাগালের মধ্যে আসবে না ।কাকের ; কোকিল হবার স্বপ্নও অধরা থেকে যাবে ।

দক্ষিণে, এক প্রযুক্তিবিদ্ ছিলেন- অনেক আগে যিনি ভারতের সেরা ইঞ্জিনীয়ার বলে মানা হয় । একবার নাকি উনি ট্রেনে করে কোথাও যাচ্ছিলেন । জানালায় কান পেতে তার যাত্রা শুরু হয় । হঠাৎ চেন টেনে দিলেন । রেলের লোকে এসে জানতে চায় কেন চেন টানা হয়েছে । তখন উনি বলেন যে সামনে ট্র্যাকে ফাটল আছে তাই চেন টেনেছেন । ট্রেন এগিয়ে গেলেই বড় অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যাবে । লোকেরা হয়ত জানতো না উনি কে তাই তর্ক করে । উনি অত্যন্ত বিনয়ের সাথে

বলেন যে ওরা দেখে এসে তারপর বলুক । তখন ওরা নেমে যায় ও এগিয়ে গিয়ে দেখে যে সত্যি সত্যি লাইনে সমস্যা রয়েছে । আর একটু, ট্রেন এগিয়ে গেলে বিরাট একটা দূর্ঘটনা হয়ে যেতো । এই মানুষটির নাম Mokshagundam Visvesvaraya---

গল্পটি সত্য নাকি গল্প তা সোনিয়া বলতে পারলো না । ও নাকি কোথায় পড়েছে । কিন্তু যা ভাবার বিষয় তা হল এই প্রযুক্তিবিদ্ একটি মেশিনকে, মানে ট্রেনকে নিজের দেহের মতন অনুভব করতে পারতেন । তাই সুক্ষ্ম কম্পনের মাধ্যমে বুঝতে সক্ষম হন এই যন্ত্রের স্বাস্থ্য ! আর মানুষকে সেদিন একটি বড় অ্যাক্সিডেন্ট থেকে বাঁচান ।

এই ভোকাল কর্ড বিশারদও খুব ট্যালেন্টেড্ । কিন্তু ভাগ্যের খেলায় তার আবিষ্কার বাক্স-বন্দী হয়েই থেকে গেলো । দিনের মুখ দেখলো না । হয়ত কোনোদিন কোনো প্রত্নবিদ্- তার খনন কার্যের মাধ্যমে এই মেশিনের ছবি পাবে আর জনসমুদ্রে দাঁড়িয়ে মেনে নেবে যে অনেক আগেই এরকম সমস্ত প্রতিভা আমাদের গরীব দেশে ছিলো ।

সোনিয়া জানেনা আজ ভারতে থাকলে তার কী হতো ! রেয়ার ক্যান্সারের এই কমিউনিটি তো বিশ্বজোড়া । তাতে ভারতের লোক কম । তবে কিছু কিছু রেয়ার

ক্যান্সার আছে যা ভারতের লোকেদের বেশি হয় । এশিয়ার লোকেদের, বেশি হয় আদতে । কিন্তু তাদের কী কোনো সংস্থা ওখানে কেউ খুলেছে ? ওখানে প্রতিটি কাজ করতে গেলে লড়াই করতে হয় । কাজেই হয়ত অভাগা সেইসব রুগীরা ওখানে ;একা একাই এক একটি যুদ্ধতে লড়ে চলেছে । রুগী বনাম অসংখ্য বিকৃত কোষ ।

ক্যান্সার মানুষকে দূরে ঠেলে দেয় । ভয়ে অনেকে দূরে চলে যায় । আবার অপরিচিত কাউকে ; এই রাজ-রোগ বা মহাব্যাধি অসম্ভব কাছে নিয়ে আসে । সেই বন্ধন কাটিয়ে যাবার কোনো চান্সই নেই আর এই জীবনে -- কারণ দূর্যোগে যারা আশ্রয় দেয় তারাই প্রকৃত বন্ধু ।

সোনিয়া এখন অনেক পরিণত । তবুও বয়ের মনে হয় যে কোনো অদৃশ্য শক্তি যেন ওদের দুজনকে একসুত্রে বেঁধে দিয়েছে । তাই হারিয়ে যাওয়া শাবানা যাকে বয়

একসময় প্রচন্ড ঘৃণা করতো সে শুধু তার তরী পার হবার নাবিকই নয় আজ- সে তার পরম বন্ধু ।

প্রথমে দেখা করতে না চাওয়া সোনিয়া এখন অনেক সাবলীল । বয়কে ; সেও নতুন রূপে ডেকেছে আর পেয়েছে । পুরনো সেইসব ঘটনা আর দুজনের মধ্যে কোনো ফাটল ধরাচ্ছে না । দুজনেই অপেক্ষা করে আছে, এক রক্তিম সূর্যোদয়ের । প্রতি কিমোর শেষে ।

কিমো নেওয়া , রেডিয়েশান থেরাপি--- দেহকে ফালাফালা করে দেয় । অন্য ক্যান্সারের ক্ষেত্রে তবুও ওগুলি পরীক্ষিত তাই কাজ করে । কিন্তু রেয়ার ক্যান্সারে ঠিক কী কী জিনিস কাজ করে, তাই নিয়ে গবেষণা নেই বেশি তাই অযথা এইসব চিকিৎসায় লোকে বিব্রত হয় ।

আজ সোনিয়া আর বয় পাশাপাশি শুয়ে কিমো ইন্‌ফিউশান নেয় । গল্প করে । গান করে । কিন্তু কেউ কাউকে টাচ্‌ করেনা । বয়ের কোনো যৌন প্রতিহিংসার প্ল্যান নেই আর সোনিয়াও আজ বয়ের পাশে শুয়েই বুঝেছে যে কাউকে পছন্দ হলে আর গভীর ভাবে কামনা করলে সে আপনিই একদিন এসে ধরা দেয় । তাকে রেপ্‌ করে নিজের প্রভুত্ব জাহির করার দরকারই হয়না ।

সোনিয়া, ইদানিং আর চার্চে গান করেনা । ওর বর ইতিহাস ছেড়ে পুলিশে থিতু হয়েছে । সোনিয়া এখন শহরে যায় একটি আজব কাজ করতে । তা থেকে ওর কিছু রোজগারও হয় । এমনিতে সে খুবই দুর্বল । ক্যান্সার ; তার সমস্ত চেতনায় এমন থাবা বসিয়েছে যে সাধারণ জীবন চালানোর কাজ করতেও অত্যন্ত কষ্ট হয় । তবুও একটি ছোট চাকরি করে সে। একটি ব্রেস্ট ক্যান্সার সংস্থায় গিয়ে ট্যাটু বানায় । যাদের স্তন বাদ পড়েছে ,তাদের চওড়া ছাতিতে এঁকে দেয় একজোড়া কিংবা একটি সুন্দর নকল বুক । ট্যাটুর মাধ্যমে । কেউ আর নিজেকে অসম্পূর্ণ মনে করেনা । অনেক মেয়েদের বুক বাদ গেলে, তাদের স্বামীরা ততক্ষণাৎ তাদের পরিত্যাগ করে । মেয়েরা, নিজেদের কষ্ট বুকে চেপে বেঁচে থাকে । যদিও নকল বক্ষের স্পর্শে সেসব স্বামীরা ফেরেনা তবুও মেয়েরা, নিজেদের সম্পূর্ণ মনে

করে । আগে ব্রেস্ট ক্যান্সার এক ট্যাবু ছিলো । মেয়েদের এই এক বিশেষ অঙ্গ যা কেবল মানুষের মিলনের অঙ্গ নয় একটি শিশুর ভরণপোষণের দায়িত্ব বহন করে , যখন বাদ পড়ে বা আক্রান্ত হয় ক্যান্সারে ; তখন তাই নিয়ে আলোচনা বা গবেষণা না করে লোকে চেপে রাখে । ভয়ে আর লজ্জায় । এখন দিনকাল বদলেছে । ব্রেস্ট ক্যান্সার নিয়ে কেউ আর লজ্জা পায়না । মাথা ব্যাথা , লাং ক্যান্সার , হাতে -পায়ের ক্যান্সারের মতন এও এখন আলোচনার বিষয় হতে পারে ।

হয়ত একদিন ---cholangiocarcinoma এরকম সবার আলোচনায় আসবে । আর রেয়ার বলে আড়ালে বা মগডালে না বসে একেবারে ক্যাম্পিং এর লেলিহান আগুনের শিখার সামনে এসে দাপটের সাথে বসবে---cholangiocarcinoma -- সঙ্গে সঙ্গে অজস্র মানুষ ; যাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বাদ পড়েছে এই ভয়াল অসুখের থাবায় - তারাও স্বীকৃতি পাবে ও পরিচিত হবে অসংখ্য মেধাবী ও নবীন গবেষকদের সাথে যারা এই রোগের পদচিহ্নই মিটিয়ে ফেলার ব্রত নিয়ে এই ধরায় এসেছে ।

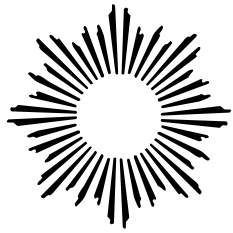

সব গল্প শুনে রাকা বলে ওঠে :: আচ্ছা বয় , তোর তো অসুখটা এখন কন্ট্রোলে আছে- কিন্তু শাবানা মানে সোনিয়া কেমন আছে ?

বয়ের চোখ দুটি জলে ভরে যায় । তারপরে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে । বলে , সোনিয়া আর বেঁচে নেই ।

আমি লাকি । সে ছিলো অভাগা । তাই এত শীঘ্রই সবাইকে ছেড়ে চলে গেছে । কোনো কোনো মানুষ, এই জগতে আসে এক সাধারণ রূপে । তারপর কোনো এক **ব্লু- মুনে ;** তারাই আমাদের নতুন দিশা দেখায় । সোনিয়া এরকমই একজন । **ওর মৃত্যুর পরে ওর সেপারেশান নেওয়া-বর্তমানে পুলিশ হওয়া পতিদেব , বয়েড্ পামার একটি ক্যান্সার সংক্রান্ত সংস্থা খোলেন । নাম ---নেকেড্ সোনিয়া পামার ।** অর্থাৎ কর্কট রোগাক্রান্ত তাঁর স্ত্রীর দেহকে ; খুব কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করো । দেখো, একটি পোশাকও নেই শরীরে । এত তার যন্ত্রণা । অথচ তুমি কী কন্ট্রিবিউট্

করেছো বা করছো এর জন্য ? কাল ওখানে তুমি বা তোমার প্রিয়জনও থাকতে পারে ।

হ্যাঁ , ঠিক সোনিয়ার মতনই যন্ত্রণা আর জ্বালা নিয়ে । আর এত কষ্ট নিয়ে- সে একটিও পোশাক পরতে পারবে না । ভয়াবহ বেদনা আর বিষের জ্বালায় তার সমস্ত আআ কঁকিয়ে উঠবে । আর সে অপেক্ষা করে থাকবে, শেষের সেই ক্ষণের জন্য । মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার জন্য ।

সোমা বলে ওঠে :: আমরা তো কিছু কিছু করে দান করতে পারি এই সংস্থায় ।

বয় বলে , **কেবল দান করলেই হবেনা । জনচেতনা বাড়াতে হবে । তবেই আসল রুগীরা উপকৃত হবে ।**

চল আমরা একটা ম্যারাথন শুরু করি --- cholangiocarcinoma **এই নামে । হয়ত এই চারাটি পোঁতা দিয়েই শুরু হবে অরণ্যায়ন । সবুজায়ন । আজ সতেজ , সজীব আলোর বড্ড দরকার আমাদের ধূসর মনে । সত্যি ।**

মাছের ঝোল, পোস্ত আর মোচার চপ্ খাবার ফাঁকে ফাঁকেই আমরা করবো এই অসুখকে জয় ।

কেউ আর গাঢ় আঁধারে থেকে, ভয় পাবেনা -- এক রেয়ার ডিজিজের শিকার হয়েছে বলে । কারণ আমরা করবো জয় , নিশ্চয় ।

বয় বুঝতে পারলো যে তার কাহিনী শুনে, আজ থেকেই যে যাত্রা শুরু করলো সবাই তা আয়তনে বিশাল । সব ম্যারাথনের জন্য- অসংখ্য পায়ের দরকার হয়না । একটি বা দুটি পদচিহ্নই রচনা করতে সক্ষম ; প্রজাপতির মুখর স্পন্দন **-----!!**

তাই এইসব ম্যারাথন সবার চোখের আড়ালেই থেকে যায় । তবুও কী ভীষণ একটি ছাপ রেখে যায় সমাজের বুকে , যার আদি অন্ত পাওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে যায় ।

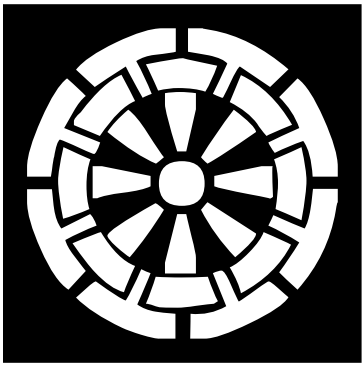

END